লোকমাতা সারদা

শ্রীপুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী

বুক হোম
৩২ কলেজ রো ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮০
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৮২

প্রকাশক :
বিশ্বজিৎ মজুমদার
গ্রন্থগৃহ
২২সি, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
হীরালাল মুখোপাধ্যায়
কন্টেমপোরারী প্রিন্টার্স
১৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
সুবোধ দাশগুপ্ত

॥ এক ॥

অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালিকাপুজো করবেন ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব। শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ষোড়শী মূর্তিতে পুজো করার আগ্রহ জাগল ঠাকুরের মনে। ভাগনে হৃদয় ঠাকুরের সাহায্যকারী। পূজার সামগ্রী যথাসময়ে সজ্জিত হল। রাত তখন নটা। আরাধ্যাদেবীর কোন প্রতিমা দেখা যাচ্ছে না। অথচ আরাধ্যাদেবীর জন্যে আলিম্পন শোভিত পীঠ স্থাপন করা হয়েছে।

সহধর্মিণী শ্রীমা সারদাদেবীকে পুজোর সময়ে ঘরে উপস্থিত থাকবার জন্যে ঠাকুর আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবার শ্রীমা ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণ করে পুজোর দ্রব্য শোধন করে নিলেন। তারপর শ্রীমাকে আরাধ্যাদেবীর নির্দিষ্ট পীঠে উপবেশন করার জন্য ইঙ্গিত করলেন। শ্রীমা কোন কিছু চিন্তা না করেই মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় পশ্চিম দিকে মুখ করে ঠাকুরের সম্মুখস্থ পীঠে উপবেশন করলেন। ঠাকুর মন্ত্রপুতঃ জল দিয়ে বারংবার শ্রীমায়ের অভিষেক করলেন। ঠাকুরের কণ্ঠে ভাবগম্ভীর প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হল, 'হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মা ত্রিপুরাসুন্দরী! সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। এঁর শরীর ও মনকে পবিত্র করে এঁর দেহে আবির্ভূতা হও। সর্বকল্যাণ সাধন কর।'

সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ষোড়শোপচারে শ্রীমা সারদাদেবীকে পুজো করলেন। ঠাকুর নিবেদিত ভোগের কিয়দংশ তুলে নিয়ে শ্রীমায়ের মুখে পুরে দিলেন। দেখতে দেখতে শ্রীমা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হয়ে সমাধিস্থা হয়ে পড়লেন। ঠাকুরও মন্ত্রোচ্চারণ

করতে করতে সমাধিরাজ্যে লীলা করতে লাগলেন। পূজক ও পূজিতা যেন আত্মসম্বরণে পূর্ণভাবে একীভূত হয়ে গেলেন।

রাত্রি গভীর হতে লাগল। ঠাকুর অর্ধসমাধিস্থ অবস্থায় নিজ সাধনার ফল এবং জপের মালা সর্বস্ব দেবীর চরণে অর্পণ করে দেবীকে বন্দনা করতে লাগলেন ঃ

"সর্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন দেবীকে। মানবীরূপিণী সারদামণি দেবীত্বের পূর্ণ বিকাশে বিকশিত হয়ে উঠলেন। . .

পূজা শেষে দেবী সারদামণি মানবীত্বের ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে নিজের ঘরে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ ভাবলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে প্রণাম করলেন—অথচ সে প্রণাম তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। তাই মনে মনে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে শ্রীমা নহবতের ঘরে ফিরে গেলেন। রাত্রের গভীর যামে শ্রীরামকৃষ্ণর সাধন জীবনে সকলের চোখের আড়ালে এক পরিবর্তন ঘটে গেল।

কে এই মা সারদামণি? দেবী না মানবী? আমরা শুনেছি, মানুষের কল্যাণের জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং নররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। শ্রীভগবানের সাথে শক্তিকেও নারীবেশে তাঁর সহগামিনী হতে দেখা যায়। তাইতো আমরা যুগে যুগে দেখতে পাই, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীর, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকার, শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনকে। শক্তি অবতারের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁকে সাহস দিয়ে লীলা প্রকাশের সহযোগিনী হন। শ্রীমা সারদামণি ব্রহ্মরূপিণী

আদ্যাশক্তি হয়েও যুগাবতারের সহধর্মিণীরূপে অবতীর্ণা হয়ে তাঁর লীলার সহচরী হয়েছেন। ভাবী ভারতকে নবযুগের অভ্যুদয়ের পথে নিয়ে যাবার জন্যে শ্রীমা সারদামণির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

আমাদের অন্তর্জগতে চলেছে অহর্নিশ সুপ্রবৃত্তি এবং কুপ্রবৃত্তির মধ্যে সংগ্রাম। তদুপরি বর্তমান যুগে আসুরিক গুণাবলী মানুষের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তাই বর্তমান জগতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন; আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিকাশ । তাইতো দেবী সারদা আবির্ভূতা হলেন লজ্জা, বিনয়, সদাচার ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে।

শ্রীভগবান্ বা তাঁর শক্তি বিশেষ যখন জগতে প্রকাশিত হন, তখন তা প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে অকস্মাৎ যুদ্ধ ঘোষণা না করে সেগুলিকেই নবরূপে রূপায়িত করেন। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করেও তাঁরা স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করে জনগণকে আদর্শের পথে নিয়ে যান। দেবী হয়েও শ্রীমা সারদা মানবীরূপে অবতীর্ণা। মানবীরূপে দেখে সাধারণ মানুষ তাঁকে প্রথমে বুঝতে পারেনি। একবার এক ভক্ত মহিলা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মা, শুনেছি আপনি ভগবতী, তবে আমরা বুঝতে পারি না কেন?'

এর উত্তরে শ্রীমা গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, 'এক ঘাটে একখানা হীরের টুকরো পড়েছিল। সবাই পাথর ভেবে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে উপস্থিত হল। সে দেখেই চিনতে পারল যে, সেখানা এক মহামূল্যবান হীরের টুকুরো।'

তাই বলি, জহুরী না হলে তো হীরের টুকরো চিনতে পারবে না। আত্মিক উন্নতি না হলে শ্রীমাকে চিনবে কি করে? শ্রীমা আত্মপরিচয় দেবেন কার কাছে? তবে হ্যাঁ, উপযুক্ত আধার পেলে শ্রীমা স্পষ্টই

নিজের দেবীত্ব স্বীকার করেছেন। স্বামী তন্ময়ানন্দ শ্রীমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মা, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যদি স্বয়ং ভগবান হন, তবে আপনি কে?'

শ্রীমা স্পষ্টই উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি স্বয়ং ভগবতী।'

শ্রীমা সারদামণি একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?'

ঠাকুর তদুত্তরে বললেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।'

নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের ব্যাপারে মাথা ঘামান না বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তিনিই যখন নর-অবতারে শক্তিসহ আবির্ভূত হন, তখনই তিনি যুগধর্ম প্রবর্তনে সক্ষম হন। শক্তিই তখন লোককল্যাণে নিয়োজিতা হয়ে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মানবসমাজের উত্থানের পথ সুগম করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে একবার শ্রীমায়ের দেবীত্ব ঘোষণা করেছিলেন। এর আগে একবার কামারপুকুরে এ সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন গ্রামবাসিগণ ঠাকুরের এ ইঙ্গিতের অর্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। শ্রীমায়ের বয়স যখন চৌদ্দ বছর মাত্র, সে সময়ে ঠাকুর একবার কামার-পুকুরে পল্লীরমণীদের ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন; শ্রীমা সেসব উপদেশ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অন্য মেয়েরা তখন শ্রীমাকে ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ঠাকুর তখন বলে উঠলেন, 'না গো না, ওকে তুলো না। এসব কথা শুনলে ও চোঁচা দৌড় মারবে।'

শ্রীমায়ের মন ছিল উর্ধ্বগামী। তাই নরলীলার উপযোগী পরিবেশ রচনার আগেই উচ্চ তত্ত্ব কথা অনর্গল শুনতে থাকলে তিনি হয়তো

গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে পড়তে পারেন—ফলে তাঁর পক্ষে লীলা বিগ্রহ ধারণ করাই অসম্ভব হয়ে পড়তে পারত। সেজন্যই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের এই সাবধানবাণী উচ্চারণ।

শিশু চোখ মেলেই মাকে দেখে চেনে জানে। মাকে কাছে পেলেই শিশুর তৃপ্তি, শিশুর আনন্দ। শিশুর মা আছেন—মা ই শিশুর ঐশ্বর্য। মা মন্ত্রের ঘনীভূত মূর্তিই শ্রীমা সারদামণি।

ঠাকুর বলেছিলেন, নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়, তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষের মতই হতে হবে। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনওবা ভয়—অবিকল মানুষের মত।'

তাই শ্রীমা সারদামণিও ছিলেন অতি সাধারণ এক নারীর মত—অথচ তিনি তো অসামান্যা এবং অদ্বিতীয়া। শ্রীমা স্বজন বিয়োগ ব্যথায় আকুল হয়েছিলেন। মাকুর শিশুপুত্র ন্যাড়ার মৃত্যুতে শ্রীমা ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করেছিলেন। মহীশূরের একজন ভক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার শ্রীমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মা, আপনি ন্যাড়ার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের মত কেঁদেছিলেন কেন?'

শ্রীমা উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি সংসারে আছি—সংসার বৃক্ষের ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। তাই আমার এই কান্না!'

শ্রীমায়ের জীবনে একদিকে যেমন ছিল পরম সমাধি, ত্যাগ ও বৈরাগ্য; অপরদিকে তাঁর চরিত্রে স্নেহ, সেবা, লজ্জা, বিনয় ইত্যাদি গুণ অপূর্বভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। স্বামী প্রেমানন্দজী বলেছিলেন, 'মা কেমন করে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, ভক্তদের এঁটো পরিষ্কার করছেন! তিনি কত কষ্ট করছেন শুধু গৃহীদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য। কি অসীম ধৈর্য আর অপরিসীম করুণা!'

শ্রীমা সারদামণি সংসারে সার দিচ্ছেন বলেই তিনি সারদা।

তিনিই আদিভূতা শক্তি—সর্বাশ্রয়দাত্রী মহামায়া। তিনিই শ্রী, তিনিই হ্রী, তিনিই লজ্জা—মানুষের সর্বতপস্যার সিদ্ধিদাত্রী। এই সংসার কি করে পরিপাটিরূপে করা যায় তা হাতে-কলমে শেখাবার জন্যেই তো মা সংসারী হয়েছেন। সংসারের সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে করে মনটাকে কি ভাবে ভগবানে নিয়োজিত করা যায়—সেটা দেখবার জন্যেই তো জগন্মাতা সারদার আবির্ভাব। সংসার কি বস্তু তিনি হাতে-কলমে বুঝেছেন, তাইতো সংসারীর প্রতি তাঁর এত ক্ষমা, এত বাৎসল্য, এত দয়া। মা ভুগেছেন দারিদ্র্যের জ্বালায়। সয়েছেন রোগ-শোক। নিজেকে জড়িয়েছিলেন সংসারের মায়াজালে। তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসীকে স্বর্গ সন্ধানের শিক্ষা দেননি। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সংসারকে স্বর্গে রূপান্তরিত করার। সংসারের সব কাজের ভেতরেই পরমতম আনন্দের আস্বাদন করার। সংসারকেই সাধনার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলার।

শ্রীমা চেয়েছেন এই জগৎটাই দেবস্থান হয়ে উঠুক মানুষের আচরণে। আত্মিক উত্তরণে যে কোনো সংসারী যেন নিজেকে দেবতার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারেন। এই রূপান্তরের পথে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হল প্রতিটি মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। প্রতিটি জীবের প্রতি সেবা। আর চাই অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও সংযম। শ্রীমা সারদামণি ছিলেন এই গুণাবলীর প্রতীক। তাঁর সাধনা ছিল সাধারণের বুদ্ধিগম্য। তাই তিনি মানবী হয়েও দেবী।

সেই জগন্মাতা সারদার অমর জীবন কাহিনী এক অমেয় অমৃত আস্বাদন।

॥ দুই ॥

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমার পূর্বপ্রান্তে জয়রামবাটি গ্রাম। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে যিনি নরদেহ ধারণ করে সর্বশ্রেয়দাত্রী মহামায়ারূপে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহ আলো করে জয়রামবাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনিই লোকমাতা সারদা।

জয়রামবাটি গ্রামখানি ছোট। এর তিনদিকে উর্বর চাষের জমি, আর এক দিকে রয়েছে আঁকাবাঁকা একটা ছোট নদী—যার নাম দামোদর। সারদাদেবীর পিতৃবংশ মুখোপাধ্যায়গণ এই গ্রামে কয়েক-পুরুষ ধরেই বসবাস করে আসছেন।

নানারকম ফসল উৎপন্ন হত বলে এই গ্রামের অধিবাসীদের অবস্থা ছিল মোটামুটি সচ্ছল। সেই গ্রামে নানা জাতের লোক বস-বাস করতেন—তাদের ছিল নানা উপাধি। মাটির ঘরে জীবন-যাত্রা ছিল সরল অনাড়ম্বর।

সারদাদেবীর পিতৃদেব রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়রা জয়রামবাটি গ্রামেরই বাসিন্দা। চার ভাই, রামচন্দ্র ছিলেন সবার বড়। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, অমায়িক ব্যবহার ইত্যাদি সদগুণের জন্য রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রামবাসীদের খুবই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী শ্যামাসুন্দরী ছিলেন শিহড় নিবাসী হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা। শ্যামাসুন্দরীও সরলতা, পবিত্রতা এবং চিত্তের দৃঢ়-তার জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

রামচন্দ্রের ছোট তিন ভাই—ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও নীলমাধব। সকলে মিলে একান্নবর্তী পরিবার। আর্থিক সচ্ছলতা এঁদের

কোনকালেই ছিল না। তবু সামান্য জমি-জমা থেকে কিছু কিছু ফসল উৎপন্ন হত। এছাড়া পৌরোহিত্য করে যা পেতেন—তা দিয়েই এঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। সংসারের দান ধ্যান ধর্মাদি কর্মেও তাঁদের যথেষ্ট সুনাম ছিল।

একবার শ্যামাসুন্দরী দেবী তাঁর পিত্রালয় শিহড় গ্রামে দেবদর্শনে গিয়েছিলেন। একদিন দেবালয়ের কাছে এক বিল্ববৃক্ষতলে তিনি কিছুক্ষণ বসেছিলেন।

হঠাৎ সেখানে একটা রুমঝুম্ শব্দ শুনে শ্যামাসুন্দরী একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। অদূরে কার যেন পায়ের রুপোর মল বাজছে। কিন্তু কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা ছোট্ট কচি মেয়ে এসে শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরল। তার পায়েই রয়েছে রুপোর মল। কচি মেয়েটি বলল, 'আমি তোমার ঘরে এলুম মা!'

শ্যামাসুন্দরী জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তিনি কতক্ষণ এভাবে ছিলেন কেউ জানে না। হঠাৎ লোকজনের নজরে পড়ায় তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল।

সে সময়ে শ্যামাসুন্দরীর স্বামী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতায়। একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর অভাব-অনটনের চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন, একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে। মেয়েটির গায়ে রয়েছে মূল্যবান নানাবিধ অলংকার—আর কি তার রূপ!

রামচন্দ্র বিস্মিত হয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন, 'কে মা তুমি?'

বীণানিন্দিত কণ্ঠে মেয়েটি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'আমি যে তোমার ঘরেই এলুম বাবা!'

রামচন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল।

কিছুদিন পর রামচন্দ্র এলেন শিহড়ে। শ্যামাসুন্দরীর কাছ থেকে দেবীর আবির্ভাবের কথা শুনলেন। রামচন্দ্র তো অবাক! তিনিও যে স্বপ্নে এমনি একটি মেয়েকে দেখেছেন!

হু'জনেরই চোখে-মুখে এক অনাবিল আনন্দের শিহরণ জেগে উঠল। তবে কি তাঁদের গৃহ আলোকিত করে সত্যি সত্যি কোন দেবীর আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে?

একদিন ভোরবেলা শ্যামাসুন্দরী ও রামচন্দ্রদেবের ঘুম ভেঙে গেল। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল এক অপূর্ব সুন্দর গন্ধ। একি কোন দেব-দেবতার গায়ের গন্ধ!

বারোশো ষাট সালের আটই পৌষ (১৮৫৩ খৃস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর), বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে রামচন্দ্রদেবের গৃহ আলো করে এক শিশু জন্মগ্রহণ করলেন। মঙ্গলধ্বনির ভেতর দিয়ে জয়রামবাটি গ্রামের লোক সেদিন জানতে পারলেন নবজাতিকার আগমন-বার্তা।

যথাসময়ে নবজাতিকার জন্মপত্রিকা সম্পাদন করা হল। শিশুর নাম রাখা হল ঠাকুরমণিদেবী আর লোকবিশ্রুত নাম সারদামণি।

সারদামণিই পিতামাতার প্রথম সন্তান।

বড়ই গরীবের সংসার। মুখার্জিদের সামান্য কয়েক বিঘা নিষ্কর জমিতে চাষ-আবাদ হয়। কিন্তু পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। রামচন্দ্রের যজমানি থেকে সামান্য আয় হত। দু-এক বিঘা জমিতে হত তুলোর চাষ। এ দিয়েই কোনক্রমে সংসার চলে যেত।

গরীবের সংসারে শ্যামাসুন্দরীকেও কাজ করতে হত। ক্ষেতে তুলোর চাষ হয়—কোলের মেয়ে সারদাকে ক্ষেতের মধ্যেই শুইয়ে রেখে তিনি তুলো তুলতেন। অনেক সময়ে সেই তুলো দিয়ে পৈতে তৈরি করে বিক্রি করা হত।

এমনি করেই সারদা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন।

ছেলেবেলা থেকেই সারদা সাদাসিধে ছিলেন। খেলার সময়ে তিনি কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতেন না। নানারকম মাটির পুতুল গড়ে তিনি খেলা করতেন। তবে কালী ও লক্ষ্মীর মূর্তি গড়ে ফুল ও বেলপাতা দিয়ে 'পুজো পুজো খেলা' করতে তিনি খুবই ভালবাসতেন। পুজো করতে করতে কিংবা পুজোর সময় মূর্তির সামনে তন্ময় হয়ে বসে থাকতে পারতেন। ছোট থেকেই ধ্যান করার অভ্যাস তাঁর চরিত্রে অনায়াস হয়ে গিয়েছিল।

একবার বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে। শিশু সারদা জগদ্ধাত্রীর মূর্তির সামনে চুপ করে বসে রইলেন—যেন তিনি ধ্যান করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন প্রতিবেশী রামহৃদয় ঘোষাল। খানিকক্ষণ পরে তার মনে হতে লাগল—কে সারদা আর কে জগদ্ধাত্রী—তিনি যেন সব কিছুই একাকার দেখতে লাগলেন। তখন তিনি ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

এমনই হয়। সাধারণ মানুষ অসাধারণ চরিত্রের বিকাশকে বুঝতে পারে না। অসাধারণ সাফল্যের আলো বা অমানবীয় বিকাশকে মানুষ তাই সহজ চিত্তে নিতে পারে না বলেই পালিয়ে যায়।

সেদিনের সারদামণির ধ্যানসিদ্ধা মূর্তিতে যে দেবীত্ব প্রকাশিত হয়েছিল তা সহ্য করতে পারেন নি বলেই রামহৃদয় ভয় পেয়ে চলে গিয়েছিলেন। অথচ সারদামণির ওই প্রকাশ খুবই স্বাভাবিক। কেননা ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী হবার জন্যই বিকশিত হচ্ছিলেন লোকচোখের আড়ালে।

॥ তিন ॥

শ্যামাসুন্দরী এলেন বাপের বাড়ি শিহড়ে। সারদা তখন কোলের শিশুটি—দু'বছর মাত্র বয়স।

শিহড়ে এক বাড়িতে গান হচ্ছিল। শ্যামাসুন্দরীও গেলেন সেই গান শুনতে শিশু সারদাকে কোলে নিয়ে।

গান হচ্ছে একটা ঘরের মধ্যে। ঘরে প্রচুর লোকের সমাগম। একদিকে পুরুষদের বসার ব্যবস্থা এবং অন্য দিকে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা।

সারদা সেই সঙ্গীতের আসরে এক মহিলার কোলে বসে গান শুনছিলেন। মহিলাটি শিশু সারদার সঙ্গে কৌতুক করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐযে এত লোক বসে আছে ওখানে ওদের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়?"

অমনি সারদা আঙুল দিয়ে দেখালেন, 'ঐ যে ওকে।'

ও যে গদাধর। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্যের ছেলে তিনি।

শিশু সারদার 'বিবাহ' শব্দের তাৎপর্যবোধ ছিল না। কিন্তু এক দৈব প্রেরণায় তিনি নিজের ভাবী পতিকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

দেখতে দেখতে সারদাও বড় হতে লাগলেন। পাঁচ বছর অতিক্রম করে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করলেন তিনি।

পিতা রামচন্দ্র মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু পাত্র খুঁজলেই কি আর সহজে পাওয়া যায়? প্রজাপতির নির্বন্ধ যেখানে, সেখানেই তো হবে বিয়ে।

এদিকে কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের জন্যও পাত্রী খোঁজাখুঁজি চলছে। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে গদাধর দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের পূজারী। কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছেন রানী রাসমণি। পিতার মৃত্যুর পর গদাধর দাদার সঙ্গে গিয়েছিলেন কলকাতায়। সেই দাদা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের পুরোহিত। হঠাৎ একদিন দাদা মারা গেলেন। তখন থেকে পুজোর দায়িত্ব এসে পড়ল গদাধরের ওপর। কিন্তু বিধি অনুযায়ী পুজো-আচ্চার দিকে মন নেই গদাধরের। পুজো করতে করতে হঠাৎ একদিন গদাধরের মনে প্রশ্ন জাগল, 'আমি কার পুজো করছি? মা মৃন্ময়ী না চিন্ময়ী? যদি চিন্ময়ী হন, তবে এত ডাকাডাকি করি, তবু তাঁর সাড়া পাই না কেন?'

কিন্তু হঠাৎ একদিন সত্যিসত্যিই মৃন্ময়ী মূর্তি জ্যোতির্ময়ী চিন্ময়ী হয়ে উঠল। গদাধর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কাতর কণ্ঠে 'মা—মা' বলে ডেকে উঠলেন। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে অহোরাত্র সাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন।

কামারপুকুরে গদাধরের জননী চন্দ্রমণি দেবী শুনলেন সে সংবাদ। অনেকে বলল, 'গদাধর পাগল হয়ে গেছে।'

আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা চলল। শান্তি-স্বস্ত্যয়ণও করা হল—কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না। আবার অনেকে পরামর্শ দিল—ছেলেকে বিয়ে দাও, তবেই তার পাগলামি সেরে যাবে।

চন্দ্রমণি প্রথমে গোপনে পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। পরে মেজ ছেলে রামেশ্বরকে পাঠালেন গদাধরের জন্য পাত্রী খুঁজতে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় পাত্রী! একদিন গদাধর শুনে বালকসুলভ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন, 'জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে কনে কুটো বাঁধা হয়ে আছে।'

ক্ষেতে যখন প্রথমে কোন ফল ফলে, গৃহস্থ তখন ফলটিতে কুটো বেঁধে রাখে। সেটি দেবতার ভোগে লাগে।

শক্তিই তো চিহ্নিত করে রেখেছেন শিবকে। জয়রামবাটিতে লোক পাঠানো হল। রামচন্দ্র মুখুজ্যে এক কথায় বিয়েতে রাজী হয়ে গেলেন। স্থির হল, বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে তিনশো টাকা পণ দেবেন আর দেবেন কিছু গয়নাগাটি নববধূকে।

গ্রামের অনেক লোক এই বিয়েতে ভাংচি দিতে চেয়েছিল— বলেছিল, 'এই পাগলা ছেলের সঙ্গে কি কেউ কখনো বিয়ে দেয়? মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

১২৬৬ সালের বৈশাখ মাস। বিয়ে হয়ে গেল সারদার সঙ্গে গদাধরের। সারদার বয়স তখন ছয় আর গদাধরের চব্বিশ।

বিয়ের সময়ে ছেলের বউকে গয়না দেবার কথা ছিল। চন্দ্রমণি তা জোগাড় করে উঠতে পারেন নি বলে খুবই মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে কয়েকখানা গয়না ধার করে এনে বিবাহের দিনে বালিকা বধূকে সাজানো হয়েছিল।

সাতাশটি কাঠি জ্বেলে বরকে প্রদক্ষিণ করার সময়ে হঠাৎ কাঠির আগুন লেগে পুড়ে গেল বরের মাঙ্গলিক বন্ধন। আঁৎকে উঠলেন অনেকে। মন খারাপ হয়ে গেল মেয়েদের।

কিন্তু গদাধর হাসতে হাসতে বললেন, 'পুড়ে গেল মায়ার বাঁধন; এতো অবিদ্যারই বন্ধন। ভালই হল।'

গদাধর বউ নিয়ে এলেন বাড়িতে। বউ দেখে সবারই কি আনন্দ!

কিন্তু মুশকিল হল লাহাদের কাছ থেকে ধার করা গয়না ফেরত দেওয়া হবে কি ভাবে? প্রতিমাকে নিরাভরণ করা হবে কি করে? এই ভেবে চন্দ্রমণি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে গদাধরের বুদ্ধি কম নয়। তিনি অচিরেই

মায়ের সমস্যা উপলব্ধি করে ফেললেন.। গদাধর মাকে বললেন, 'এতে ভাববার কি আছে? সারদা ঘুমুলে পর আমি ওর গা থেকে গয়নাগুলো খুলে দেব।'

সারদামণি ঘুমিয়ে পড়লে পর গদাধর সাবধানে একটি একটি করে গয়না ওঁর গা থেকে খুলে নিয়ে এলেন।

কিন্তু পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সারদা দেখতে পেলেন তাঁর গায়ে গয়না নেই। তিনি তখন চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন।

চন্দ্রমণি আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। সারদাকে সাশ্রু নয়নে কোলে তুলে নিলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, 'মা, এই সামান্য গয়নার জন্য তুমি ভাবছ কেন? গদাই তোমাকে এরচেয়ে অনেক ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে।'

সারদা শান্ত হলেন। কিন্তু তাঁর কাকা মোটেই শান্ত হলেন না। তিনি সারদাকে নিরাভরণ দেখে, তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে সোজা জয়রামবাটির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, 'বুঝতে পেরেছি, এসব চালাকি ছাড়া আর কিছু নয়।'

কিছুদিন পর গদাধর এলেন শ্বশুরবাড়ি। সারদা শুনেছেন, স্বামীর সেবা-যত্ন করতে হয়। তাই তিনি দৌড়ে গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে এলেন। স্বামীর পা ধুইয়ে দিলেন। তারপর গামছা দিয়ে স্বামীর পা মুছিয়ে দিয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন।

যে স্বামী তাঁর গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছিলেন তাঁর উপর সারদার আর কোন অভিমান নেই।

কিছুদিন জয়রামবাটিতে থেকে গদাধর সারদাকে নিয়ে এলেন কামারপুকুরে, নিজের বাড়িতে। কিন্তু দিন কয়েক পরেই গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়ে আবার সাধনসাগরে নিমগ্ন হলেন।

॥ চা র ॥

....

সারদামণি ফিরে এলেন পিতৃগৃহে জয়রামবাটিতে। পিতামাতার দারিদ্র্যের সংসার। তাই সারদার কাজ-কর্মেরও বিরাম নেই।

পুকুরে নেমে গলা জলে দাঁড়িয়ে গরুর জন্য ঘাস কাটতে হয় সারদাকে। তিনি প্রায়ই দেখতে পেতেন, তাঁরই মত আরেকটি মেয়ে জলে নেমে ঘাস কেটে দিচ্ছে নিজে থেকে। সারদার মতই সমবয়সী কৃষ্ণাঙ্গী। অথচ তাঁদের মধ্যে কোন রকম কথা-বার্তা নেই।

সারদা অবাক হয়ে যেতেন। কে এই মেয়েটি! তাকে তো আগে কোনদিন দেখেছেন বলে মনে হয় না। তবু যেন মনে হয়, খুব চেনা চেনা।

স্নেহময়ী মায়ের যত্নে পল্লী সৌন্দর্যের মধ্যে আপন মনে গড়ে উঠতে লাগলেন সারদা। ছোট ভাইয়েরাও ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল। তাদের সমস্ত ঝামেলা সারদার উপর। ছোট ভাইদের দামোদর নদে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন সারদা। স্নানের শেষে গাছতলায় বসিয়ে দুটি মুড়ি খাইয়ে ওদের বাড়ি নিয়ে আসতেন তিনি।

শুধু কি এই? মা শ্যামাসুন্দরী যেদিন রাঁধতে পারতেন না, সেদিন সারদাই ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে দিতেন। হাঁড়ি নিজে নামাতে পারতেন না বলে, ভাত সেদ্ধ হয়ে গেলে পর বাবাকে ডাকতেন। বাবা এসে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দিয়ে যেতেন।

ক্ষেতে কাজ করার জন্য কোন কোন সময়ে দিনমজুর লাগানো হত, সারদা তাদের জল খাবার মুড়ি-গুড় ক্ষেতে পৌঁছে দিতেন।

আবার অনেক সময় সারদা গাছ থেকে তুলো তুলে এনে মায়ের কাছে পৈতের জন্য সুতো কাটা শিখতেন। সব কাজেই তাঁর সমান উৎসাহ। কোন কাজেই তাঁর ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই।

সারদাকে প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তবুও তাঁর বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহের অভাব ছিল না। শ্বশুর গৃহেও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি কিছু কিছু লেখা-পড়া শিখেছিলেন। সারদা বলেছিলেন, 'কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি বর্ণপরিচয় একটু একটু পড়তুম। একদিন ভাগনে হৃদয় বই কেড়ে নিল, বলল, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?' আমি আবার গোপনে আরেকখানি বই এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমাকে পড়াত।'

কিন্তু সারদার পুঁথিগত লেখাপড়া তেমন বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। অবশ্য দক্ষিণেশ্বরে গিয়েও তাঁর বিদ্যোৎসাহের অভাব দেখা দেয়নি।

সারা বাঁকুড়া জেলা জুড়ে একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। কথা নেই, বার্তা নেই, কাতারে কাতারে লোক এসে হাজির হল জয়রামবাটিতে, রামচন্দ্রদেবের বাড়িতে। রামচন্দ্র নিজেই গরীব, আর এত লোককে খেতে দেবেন কি করে?

সারদা কিন্তু মোটেই ঘাবড়ালেন না। সাদর আমন্ত্রণ জানালেন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানবাত্মাকে। যিনি স্বয়ং ভগবতী তাঁর আবার চিন্তা কি?

ধান সেদ্ধ করে চাল করা হতে লাগল। আর রান্না হতে লাগল হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি। সারদা কোমর বেঁধে লেগে যান খিঁচুড়ি পরিবেশনে। আবার পাখা নিয়ে বাতাস করেন তাড়াতাড়ি খিঁচুড়ি জুড়োবার জন্যে। এভাবে অসংখ্য লোককে খিঁচুড়ি খাওয়ানো

হল। সবাই তৃপ্ত হয়ে ফিরে গেল। এ যেন সারদার অন্নপূর্ণার মতো রূপ।

জয়রামবাটির শান্ত পরিবেশে বড় হতে লাগলেন সারদা। ধীরে ধীরে বাল্যকাল অতিক্রম করে তিনি দাঁড়ালেন এসে কৈশোরের সন্ধিক্ষণে।

সারদা খবর পেলেন গদাধর এসেছেন কামারপুকুরে। কয়েক দিন পরেই আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবেন তিনি।

একদিন একজন লোক এসে হাজির হল কামারপুকুর থেকে। চন্দ্রমণি পাঠিয়েছেন ছেলের-বউকে নিয়ে যাবার জন্যে। সারদার মনও তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কিসের এক অভূতপূর্ব আকর্ষণে।

শ্যামাসুন্দরী মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে যাবি নাকি শ্বশুরবাড়ি ?'

সারদা কোন কিছু চিন্তা না করেই বললেন, 'হ্যা মা, যাব।'

মাও খুশি হয়ে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন শ্বশুড়বাড়ি।

গদাধর সারদার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ছোট্ট পুতুলের মত বউটি এখন কেমন ডাগর হয়ে উঠেছে। স্বভাবসুলভ লজ্জাও যেন সারদার দেহ মনকে ঘিরে অপূর্ব এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। যা মানবীয় নয় ঐশ্বরিক।

প্রায় সাত বছর পর গদাধর নিজ মাতৃভূমি দর্শন করতে এসেছেন। এই কয়বছর তিনি দক্ষিণেশ্বরে তন্ত্র এবং বেদান্ত নিয়ে কঠোর সাধনা করে চরম তত্ত্বলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। এখন তিনি আর গদাধর নন—শ্রীরামকৃষ্ণ নামেই সমধিক পরিচিত।

সারদামণিও স্বামীর কাছ থেকে সুশিক্ষালাভ করার জন্য তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন। রামকৃষ্ণদেবও শেখাতে লাগলেন সারদামণিকে সংসারের নিত্যকর্ম পদ্ধতি—শেখালেন কি করে অতিথিসেবা করতে হয়, কি করে সন্ধ্যাদীপ দিতে হয়।

কিশোরী সারদার হৃদয় প্রেমের স্পর্শে জয় করে রামকৃষ্ণদেব সারদাকে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে উন্নত করে তুলতে লাগলেন। তিনি সারদাকে শেখালেন, গুরুজনদের প্রতি সেবাপরায়ণতা ও কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা। তিনি আরো শেখালেন ত্যাগোজ্জ্বল জীবনাদর্শ কি করে গড়ে তুলতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদাকে শেখালেন, মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরলাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া। চাঁদ-মামা যেমন সকলেরই মামা, ঈশ্বরও তেমনি সকলেরই আপনার। যে তাঁকে মনে প্রাণে ভালবাসে, তিনি তার কাছেই ধরা দেন। ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এছাড়া, জীবনের আর কোন মূল্যই নেই।

সারদামণিও রামকৃষ্ণদেবকে জীবনের ধ্রুবতারা করে তাঁর নির্দেশিত পথে সাধন-ভজন করতে লাগলেন।

সেসময়ের কথা স্মরণ করে সারদামণি পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন, 'হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর, স্থির, দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।'

॥ পাঁচ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে ফিরে গিয়ে তিনি সাধনপথে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

আর শ্রীমা সারদা? তাঁর স্বভাবেও দেখা গেল এক আমূল পরিবর্তন। তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন শান্তস্বভাবা এবং চিন্তাশীলা। কিন্তু মনের কোণ থেকে একটা অস্ফুট বেদনা যেন মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটায়। কামারপুকুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে তিনি এক দৈব আনন্দের অধিকারিণী হয়েছিলেন। সে সুখস্মৃতি তাঁর মনকে মোহিত করে রাখে। বিরহ বেদনার ভেতর দিয়ে কেটে যায় সুদীর্ঘ চার বছর। তবুও কি মিলনের শুভক্ষণটি আবার আসবে না? লোকে যাঁকে পাগল বলে, তিনি তো এক দেবমানব। মহাসাধক পরমপুরুষ। ভগবৎ চিন্তায় বিভোর। তাই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সারদামণির মন-প্রাণ আপ্লুত হয়ে ওঠে। একটা অপার্থিব গৌরববোধ সব সময় তাঁর মনকে ঘিরে রাখে।

স্বামীর সেবায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করার জন্য এক দুর্বার আকর্ষণ দিনে দিনে দুর্নিবার হতে থাকে। ছটফট করতে লাগলেন সারদাদেবী। স্বামীর সান্নিধ্যে তাঁর জীবনও আধ্যাত্মিকতার প্রদীপ্ত প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু সে সুযোগ আর আসছে কোথায়? একি শবরীর না সতীর প্রতীক্ষা?

শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। সুযোগ এল।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পুণ্য জন্মতিথি। সারদামণি জানতে পারলেন, কয়েকজন গ্রামবাসী সেই পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে

কলকাতায় যাচ্ছেন গঙ্গাস্নানে। তিনি ভাবতে লাগলেন, তাদের সঙ্গে কলকাতায় গেলে হয় না? অথচ ভয়ে ও লজ্জায় সারদামণি বাবাকে কিছুই বলতে পারেন না। কিন্তু মনের ভাবইবা তিনি গোপন করবেন কি করে! আর না পেরে একদিন একটি মেয়েকে সব কথা খুলে বললেন। মেয়েটি সারদামণির পিতা রামচন্দ্রদেবকে তাঁর মনের খবর জানাল।

রামচন্দ্রদেবতো এক কথাতেই রাজী। 'সারদা যাবে কলকাতায়—বেশ তো! আমিই নিয়ে যাব সারদাকে সঙ্গে করে।'

তখন ট্রেন স্টিমারের নাম-গন্ধও ছিল না। পালকি করে অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু তাতে প্রচুর খরচা। এত খরচ বহন করার মত অবস্থা কোথায় রামচন্দ্রদেবের। স্থির হল, সবার সাথে পায়ে হেঁটেই যাবেন।

পথের দুই ধারেই উন্মুক্ত মাঠ। মাঠে রয়েছে রবি শস্যের শ্যামল ছবি। রাস্তায় মাঝে মাঝে রয়েছে বট অশ্বত্থের বিটপী। এই বৃক্ষগুলো যেন শ্রান্ত পথিকদের বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এত হাঁটার অভ্যাস নেই সারদামণির। এতদিন তিনি এতদূর হাঁটেন নি। শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে শরীর একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। একি দুরন্ত অভিসার সারদার!

পথশ্রমে অনভ্যস্ত সারদা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তাঁর পক্ষে হেঁটে যাবার অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। সামনের এক চটিতে গিয়ে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। অন্যান্য সঙ্গীরা তাঁদেরকে ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে লাগল।

মনে মনে ইশ্বরের নাম স্মরণ করলেন রামচন্দ্রদেব। এই দুর্গম পথে সারদাকে নিয়ে কি বিপদেই না পড়লেন তিনি। কত দিনে জ্বর ছাড়বে তাই বা কে জানে? প্রবল জ্বরে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন সারদা। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলেন, একটি কালো কুচকুচে অথচ

অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে তাঁর বিছানার পাশে এসে বসল। তারপর মেয়েটি সারদার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সারদা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে থা থেকে এলে মা?'

নবাগত মেয়েটি বলল, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি।'

দক্ষিণেশ্বরের কথা শুনে সারদার মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি হল। তিনি দুঃখ করে বললেন, 'আমিও দক্ষিণেশ্বরে যাব মনে করেছিলুম। আমার স্বামীকে দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু আমার আর সে সৌভাগ্য হল না।'

শুনেই মেয়েটি সস্নেহে বলল, 'চিন্তা করো না। কাল সকালের মধ্যেই তুমি সেরে উঠে স্বামীর কাছে যাবে বৈকি!'

মুহূর্তে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল সেখান থেকে।

পরের দিন সকালবেলাতেই সারদামণির জ্বর ছেড়ে গেল।

সারদা ভাবতে লাগলেন, এই সুষমামণ্ডিতা কৃষ্ণবর্ণা মেয়েটি কে? দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই কি এসে তাকে দেখা দিয়ে গেলেন!

সারদার শরীরের ও মনের সব শ্রান্তি কাটিয়ে দূর হয়ে গেল। এক অনাবিল আনন্দে তাঁর মন ভরে গেল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করতে লাগলেন।

আর কালবিলম্ব না করে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্য সারদা পিতাকে বললেন। পিতা রামচন্দ্রদেব সারদার অসুস্থতার জন্য আপত্তি তুললেন। কিন্তু সারদা জোর দিয়ে বলাতে সেদিন সকাল-বেলাতেই আবার তাঁরা রওনা হলেন।

কিছুদূর যেতেই একখানা পালকি পাওয়া গেল। পালকি চড়ে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরের দিকে যেতে লাগলেন। পথে আবার জ্বর এল সারদার—কিন্তু এবারে জ্বরের প্রকোপ তেমন তীব্র নয়।

তাঁরা যখন দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন, তখন

বারবেলা। তাই তাঁরা বারবেলাটা কাটালেন একটা নৌকোয়।

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে প্রবেশ করবার সময়ে সারদার কত সংশয়—কত দুশ্চিন্তা। দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে রামকৃষ্ণদেব সারদার কোন খোঁজখবরাদি করেন নি। পত্নীর কথা কি তিনি একেবারে ভুলে গেছেন? সারদার মনে পড়ল পথে দিব্য দর্শনের কথা। তাই তাঁর মনে খানিকটা আশার আলোও দেখা দিল। তিনি দোদুল্যমান-চিত্তে ঠাকুরের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

সারদামণি এসেছেন শুনেই রামকৃষ্ণদেব হাঁক দিয়ে বললেন, 'ও হৃদু! বারবেলা নেই তো রে? ও প্রথমবার এখানে আসছে।' ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথায় একটা প্রাণঢালা প্রেমের স্পর্শ ছিল। তাই সারদামণি সোজা ঠাকুরের ঘরে গিয়েই উঠলেন। রামচন্দ্রদেব নহবতের ঘরে চলে গেলেন।

রামকৃষ্ণদেব সারদামণিকে দেখে বললেন, 'তুমি এসেছ—বেশ করেছ,' বলেই আবার হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওরে, একটা মাদুর পেতে দে।'

মাদুর পাতা হলে সারদামণি মাদুরে বসে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। দুঃখ করে বললেন ঠাকুর, 'এখন কি আর সেজবাবু আছেন যে তোমার যত্ন করবেন? আমার যেন ডান হাত ভেঙে গেছে।'

ভক্ত জমিদার মথুরামোহনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন ঠাকুর। মথুরামোহন নিজেই ঠাকুরের সব দেখাশোনা করতেন।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে সারদামণির চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণদেব তা ভাল করে লক্ষ্য করলেন। সারদামণি নহবতে গিয়ে থাকতে চাইলে রামকৃষ্ণদেব তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না-না, ওখানে থাকবে কি? ওখানে থাকলে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে। এ ঘরেই থাক।'

সবার রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। এখন সারদামণিরা খাবেন কি? ভাগ্‌নে হৃদয়কে ঠাকুর ডেকে ওঁদের জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে বললেন।

হৃদয় দু'তিন ধামা মুড়ি নিয়ে এল। সারদামণি ক'টি মুড়ি চিবিয়ে শুয়ে পড়লেন সেই মাদুরের উপর।

কি শান্তিময় সেই রাত্রি। কি মধুর এক পরিপূর্ণতা। সারদামণি উপলব্ধি করলেন তাঁর অন্তরের ঘটটি যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। সফল হয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার। জীবনের সব মোক্ষ যেন এই রাত্রিতে সিদ্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেঝেতে শুয়ে অনাবিল শান্তিতে ঘুমুলেন সেই রাত্রিতে।

পরদিন ঠাকুরের নির্দেশে সারদামণিকে ডাক্তার দেখান হল। ডাক্তার এসে ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। ভালভাবে চিকিৎসা করানোর ফলে তিনচার দিনের মধ্যেই সারদামণি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। রামচন্দ্রদেব এবার নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরলেন।

সারদামণি সুস্থ হয়ে ওঠার পর থেকে নহবতের ঘরে থাকেন। সেখানে আছেন ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করে সারদামণির মন জুড়িয়ে গেল। ঠাকুরের কেমন দিব্যকান্তি! কেমন করুণাঘন চোখ। কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! এই দিব্য সান্নিধ্য ছেড়ে তিনি কিনা পড়েছিলেন জয়রাম-বাটিতে। সারদামণি মন স্থির করে নিলেন, ঠাকুরের সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। প্রয়োজন হলে দক্ষিণেশ্বরের তরুমূলেই তিনি আঁচল পেতে শোবেন। তৃণাসনই হবে তাঁর পক্ষে রাজেন্দ্রাণীর সিংহাসন।

স্ত্রীর মন পরীক্ষা করবার জন্য ঠাকুর একদিন সারদামণিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীগো! তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছ?'

সারদামণি ঠাকুরকে পরিষ্কার জবাব দিলেন, 'আমি তোমাকে সংসার পথে নিয়ে যাব কেন? তোমার ধ্যান-ধারণায় যদি আমি বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারি, তবেই আমার জীবন ধন্য হয়ে যায়। তাইতো তোমার সেবা করতে এসেছি—সংসার পথে টেনে নিয়ে যাবার জন্য নয়।'

এ যেন শিবের সাথে শক্তির মহামিলনের ইঙ্গিত। এ যেন পুরুষ ও প্রকৃতির পরম লীলার জন্য মহা প্রস্তুতি।

শ্রীমা একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?'

ঠাকুর কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করে অতি স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কি আত্মবিশ্বাস। তিনি নিঃসংশয়ে চিনে নিয়েছেন নিজের সহধর্মিণীকে। যিনি পরমাপ্রকৃতির আরেক প্রকাশ। তাঁর সাধন জীবনকে সম্পূর্ণ করবার জন্য, লীলাকালকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্য আবির্ভূতা।

জগৎজননী সারদা বধূরূপে, সাধারণ মানবীরূপে বিরাজিতা। মুহূর্তকালের জন্য আত্মসমাহিত হলে আমরাও শ্রীমায়ের জগৎ-জননীরূপ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হব।

॥ ছয় ॥

ঠাকুরের নির্দেশে কয়েকদিন ধরে সারদামণি আছেন ঠাকুরের ঘরেই।

মাঝরাতে প্রায়ই ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। ঘোমটা সরিয়ে তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের চোখে ঘুম নেই। তিনি নিশ্চল পাষাণের মত বসে বসে ধ্যান করেন।

একদিন ভয় পেলেন সারদা। ধ্যানে বসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল। সমাধি অবস্থা সম্পর্কে সারদার তখনও বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। তিনি ভয়ে চীৎকার করে ভাগ্নে হৃদয়কে ডাকতে লাগলেন। হৃদয় এসে রামকৃষ্ণদেবের কানে মন্ত্রোচ্চারণ করার সাথে সাথে তিনি সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এলেন। তাঁর দেহে আবার প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল। এই দৃশ্য দেখে সারদামণি বিস্ময়ে ও আনন্দে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন।

এরপর রামকৃষ্ণদেব নিজেই যত্ন করে সারদামণিকে শিখিয়ে দিলেন সেই মন্ত্র। এখন আর ভয় নেই সারদার। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার চাবিকাঠি এবার তাঁর হাতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধি আর জগন্মাতা সারদা মহামন্ত্র।

তবু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝতে পারলেন, রাত্রে প্রায়ই সারদামণিকে সচকিত হয়ে থাকতে হয়। তাই তিনি ঘুমাতে পারেন না। ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীমা আবার নহবতেই বাস করতে লাগলেন।

নহবতের নীচের তলার ঘরখানি একেবারেই ছোট। ছোট্ট একটুখানি দরজা। ঢুকতে গেলেই মাথা ঠুকে যায়। এই ঘরেই বাস করেন জগন্মাতা সারদা।

এই ছোট্ট ঘরখানিতে তাঁর বিরাট সংসার পাতা। এখানেই আছে বাসন-কোসন, ভাঁড়ারের জিনিস-পত্র, জলের জালা আর হাঁড়িতে জিয়োনো ঠাকুরের জন্যে মাছ।

এই ছোট্ট ঘরখানিতে সারাদিন কাটাতে শ্রীমার কতই না কষ্ট হয়। শরীরও তাঁর ভাল নেই। লজ্জাশীলা বলে তিনি দিনের বেলা বেরতেন না সহজে। মন্দিরের কর্মচারীরাও অনেক দিন পর্যন্ত জানতে পারেনি যে, এখানে রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বাস করছেন।

একদিন পূর্ণিমার আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত দেখে শ্রীমা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বললেন, 'আমার মনটি জ্যোৎস্নার মত নির্মল করে দাও।' আবার একদিন গঙ্গাজলে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'চাঁদেরও কলঙ্ক আছে—আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।'

সারদামণি ঠাকুরের সেবায় মন-প্রাণ সমর্পণ করে দিলেন। এক ঈশ্বরীয় ভাবের তন্ময়তায় তিনিও আবিষ্ট হয়ে রইলেন। সেই দিব্য-সেবিকালীলা এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। আধ্যাত্মিকতার সুউচ্চ ভূমিতে বিচরণকালে ঠাকুর অনেক সময় নিজেকে জগদম্বার সখী বলে মনে করতেন। অপাপবিদ্ধা সারদামণিও সানন্দে কাঁচুলি ও অলঙ্কারাদি দিয়ে ঠাকুরকে নারীবেশে সাজিয়ে নিজেকে তাঁর সখী ভেবে আনন্দিত হতেন।

এমনি করেই ঠাকুর আর শ্রীমার মধ্যে গুরুশিষ্যার সম্পর্ক অঙ্কুরিত হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক আবৃত হয়ে যায়। সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুর আসনে আসীন হলেন। আর শ্রীমা তাঁর শিষ্যা। শুধু শিষ্যা বলি কেন, শ্রীমাও সন্ন্যাসিনী। সংসারী সন্ন্যাসিনী। সংসারে থেকে সব কাজ পরিপাটিরূপে করে এক আনন্দময় ঈশ্বরীয় উপলব্ধিতে মনকে কি করে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যেই তো শ্রীমা সংসারী সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

রোজ ভোর তিনটের সময় উঠে শ্রীমা গঙ্গাস্নানে যান। এত অন্ধকারে গঙ্গার ঘাটে যাওয়া সত্যিই সাঙ্ঘাতিক। ভয়ে গা ছমছম করে। কিন্তু শ্রীমা যেন কোথা থেকে এক অলৌকিক শক্তি খুঁজে পান। শ্রীমা দেখতে পান নহবত থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত এক অপূর্ব আলোর রেশ। সেই আলোর রেখা দেখে দেখেই তিনি গঙ্গার ঘাটে নেমে স্নান করেন। শুরু হয় প্রাত্যহিক কাজকর্ম।

আর তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মই কি কিছু কম?

স্নান সেরে তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন। তারপর লেগে যান সংসারের নিত্যকর্মে। সারদামণি ঠাকুরের জন্য খাবার তৈরি করেন। আবার শাশুড়ী চন্দ্রমণি দেবীর সেবা-যত্নও সব নিজের হাতেই করেন।

পরিপাটি করে থালা সাজিয়ে নিয়ে যান ঠাকুরের ঘরে। ঘোমটা টেনে বসে ঠাকুরকে খাওয়ান। ঠাকুরও কোন কোন দিন খেতে খেতে বলেন, 'বা! রান্নাটা খুব ভাল হয়েছে তো! সত্যি তুমি খুব ভাল রান্না করতে পার।'

ঠাকুরকে খাইয়ে নহবতে বসে শ্রীমা পান সাজেন। কোন কোন দিন পান সাজতে সাজতে গুনগুনিয়ে গান ধরেন, 'ও প্রেম রত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে।' নীলকণ্ঠের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলেন এই গান। নীলকণ্ঠ একজন ভক্ত। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে এসে সে গান করে। তাঁর গানের গলা ছিল খুব মিষ্টি আর সুরেলা।

একদিন শ্রীমা ঠাকুরের জন্য থালা সাজিয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন, এমন সময়ে একজন মহিলা ভক্ত এসে বলল, 'মা, আমাকে দিন। আমি ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছি।'

সারদামণি মহিলাটির অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি যে সবার মা। তাই মহিলাটির হাতেই তুলে দিলেন ঠাকুরের খাবারের থালা-বাটি। মহিলাটি ঠাকুরকে খাবার দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শ্রীমা এবার ঘরে ঢুকলেন। ঠাকুর তখনো খেতে আরম্ভ করেন নি তিনি যেন মায়েরই অপেক্ষা করছিলেন।

মাকে দেখেই ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি জানোই তো যে আমি সবার হাতের ছোঁয়া খেতে পারি না। তা আমার খাবার তুমি নিজে না এনে অন্যের হাত দিয়ে পাঠালে কেন?'

শ্রীমা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আজ খেয়ে নাও।'

ঠাকুরের বিরক্তি তখনো যায় নি। তিনি আবার বললেন, 'তোমাকে শপথ করে বলতে হবে যে. তুমি আর কখনও আমার খাবার অন্যের হাত দিয়ে পাঠাবে না। তাহলেই আমি খাব—নইলে আমি খাব না।'

সারদামণি তখন মিনতি করে বললেন, 'না-না, আমি তা পারব না।'

'কেন?' ঠাকুর অবাক হয়ে গেলেন।

'যে আমাকে মা বলে ডাকবে—তাকে আমি ফিরিয়ে দেব কি করে? অবশ্য কোন বাধা না পেলে তোমার খাবার আমি নিজে হাতেই নিয়ে আসব।' সারদামণি মমতামাখা অথচ দৃঢ়কণ্ঠে এই উত্তর দিলেন।

ঠাকুর তখন আর আপত্তি করলেন না। খুশি মনেই খেতে লাগলেন।

॥ সাত ॥

···

হবতের ঘরখানা খুবই ছোট। সে ঘরেই আছেন শ্রীমা নেক দিন ধরে। যিনি জগতের বন্দিতা, তিনিই যেন কারাগারের ন্দিনী।

ঠাকুর অনুভব করতে পারলেন সারদামণির অসুবিধা, কষ্ট। কথায় থায় তিনি একদিন ভক্ত শম্ভু মল্লিকের কাছে ব্যাপারটা বলেই ফেললেন।

শম্ভু মল্লিক হন্তদন্ত হয়ে কালীবাড়ির বাগানের কাছেই জমি সংগ্রহ করে ফেললেন। আর এক ভক্ত পাঠিয়ে দিল কিছু শাল কাঠ। এ জিনিসগুলো দিয়ে সেখানে সুন্দর একটা চালাঘর তৈরি করা হল।'

ঠাকুর সারদামণিকে ডেকে বললেন। 'এখন থেকে তুমি চালা রেই থাক। নহবতের ঘরে খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার।'

সারদামণি চলে গেলেন সেই চালা ঘরে। কিন্তু চালা ঘরে যেতে কষ্ট হল তাঁর। চালা ঘরে একটু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও, ঠাকুরের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে এলেন তিনি। তাই মন তাঁর বিষণ্ন। কিন্তু উপায় কি? ঠাকুর নিজে যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তা অমান্য করা চলে না।

চালাঘরেই ঠাকুরের জন্য রান্না-বান্না করেন সারদামণি। বড় বড় বাটি সাজিয়ে ঠাকুরের জন্য খাবার নিয়ে যান। অথচ বাটিগুলোতে খাবারের আভিজাত্য নেই কিছু। সামান্য শাক-চচ্চরি আর মাছের ঝাল। ছোট বাটি হলে ঠাকুরের তৃপ্তি হয় না। একদিন তিনি রসিকতা করে বললেন, 'আমি কি পাখি যে ঠুকরে ঠুকরে খাব।'

সারদামণি যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা না হলে, তিনি যা রাঁধেন শাক-চচ্চড়ি আর ব্যঞ্জন, তা খেয়েই ঠাকুর তৃপ্ত হন কি করে? ঠাকুর একদিন সাদরামণিকে বললেন, 'তুমি না থাকলে আমাকে এমন পরিপাটি করে কে রেঁধে খাওয়াতো?'

কি মনে করে ঠাকুর একদিন হঠাৎ এসে হাজির হলেন সেই চালাঘরে। কোনদিন আসেন নি। ঘরে পা দিতেই শুরু হয়ে গেল মুশলধারে বৃষ্টি। সেকি বৃষ্টি! আকাশ উপুড় করা জল ঝরতে লাগল। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত বাড়ল। তবুও বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই!

বলতে হবে সেদিন সারদামণির কপাল ছিল ভাল। ঠাকুরকে সেদিন তিনি নিজের সান্নিধ্যে পেলেন অনেকক্ষণ ধরে। একি শ্রীমায়েরই আকর্ষণ? ঈশ্বর যেমন ভক্তের আহ্বানে সাড়া দেন, ঠাকুরও সাড়া দিলেন শ্রীমার নীরব আকুলতায়।

ঠাকুর বললেন, 'বৃষ্টির জন্য তো আর যেতে পারছি না। তাহলে রান্নাটা চাপিয়ে দাও। একেবারে খেয়ে-দেয়েই এখান থেকে যাই।'

শ্রীমা রাঁধলেন সামান্যই। কেবল ঝোল আর ভাত। তাই যেন অসামান্য হয়ে উঠল। শ্রীমা কাছে বসে পরিপাটি করে খাওয়ালেন ঠাকুরকে।

কিছুদিন পর ঠাকুরের খুব আমাশয় হল। তিনি খুব কাহিল হয়ে পড়লেন। উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা করা দরকার। কিন্তু ঠাকুর তো শ্রীমাকে আহ্বান জানান নি? তাই শ্রীমা ঠাকুরের আহ্বানের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন।

হঠাৎ কাশী থেকে একটা মেয়ে এসে হাজির হল। তাকে কেউ চেনে না। সে লেগে গেল ঠাকুরের সেবায়।

ঠাকুরের স্ত্রী দক্ষিণেশ্বরেই আছেন জেনে সে এসে হাজির হল সারদার চালাঘরে। মেয়েটি সারদাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঠাকুরের কাছে। ঘোমটায় সারদার মুখ ঢাকা। একটানে সারদার

ঘোমটা সরিয়ে দিল মেয়েটি।

এই অবস্থা দেখে ঠাকুর বিছানার উপর বসে স্তব শুরু করে দিলেন, 'তুমি শক্তিরূপিণী, তুমিই পরমা আদ্যাপ্রকৃতি, বিশুদ্ধাবোধস্বরূপা।'

বর্ষার সময়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আমাশয় রোগ দেখা দিত। চালাঘরে থেকে থেকে সারদামণিও আমাশয়ে আক্রান্ত হলেন। শম্ভু মল্লিক তাড়াতাড়ি ডাক্তার-বদ্যি এনে সারদামণির চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। রোগ কিছুটা কমলেও, সারদামণির শরীর একেবারে ভেঙে গেল। অনেকে বললেন, স্থান পরিবর্তন করলে হয়তো তাঁর শরীরের উন্নতি হতে পারে।

কিন্তু সারদামণি চলে গেলে ঠাকুর আর চন্দ্রমণিদেবীর সেবা করবে কে ?

ঠাকুর একদিন সারদামণিকে ডেকে বললেন, 'সত্যিই তোমার শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। বাপের বাড়ি ঘুরে এস, তাতে যদি কিছু সুফল পাওয়া যায়।'

সারদামণি চলে এলেন জয়রামবাটিতে। মা শ্যামাসুন্দরী মেয়েকে দেখে একেবারে আঁৎকে উঠলেন—কি চেহারা হয়েছে সারদার !

গরীব বিধবা মা একেবারে মুশড়ে পড়লেন। কি ভাবে তিনি মেয়ের চিকিৎসা করবেন ? পাড়াগাঁয়ে ভাল ডাক্তার কোথায় ?

দিন যায় কিন্তু সারদামণির অসুখ বেড়েই চলে। উপশমের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। তবে কি এভাবেই একটু একটু করে অনিবার্য মৃত্যু ?

বাড়ির অদূরেই একটা পুকুর। সেখানেই বারে বারে শৌচে যান সারদামণি। বারে বারে হেঁটে যেতেও যেন পা ভেঙে আসে।

একদিন পুকুরের জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আঁৎকে উঠলেন সারদামণি। ভাবলেন, এ অস্থিচর্মসার দেহ রেখে লাভ কি ? শরীর রক্তশূন্যতায় ফুলে গেছে। নাক-কান দিয়ে জল ঝরছে।

সারদা মনে মনে স্থির করলেন, পুকুরের জলে ডুবে মরবেন। এমন সময়ে একটি মেয়ে এগিয়ে এল। গাঁয়েরই মেয়ে হবে হয়তো। সারদামণিকে অসুস্থ দেখে, সে তাঁর হাত ধরে বাড়ি নিয়ে গেল।

গ্রামে আছে এক সিংহবাহিনীর মন্দির। নামেই মন্দির। মন্দিরের বড় জীর্ণদশা। পারতপক্ষে কেউ সেদিক মাড়াতে চায় না।

সারদার কি খেয়াল হল; গেলেন সেই সিংহবাহিনীর মন্দিরে। সেখানে গিয়ে তিনি হত্যে দিলেন; বললেন, 'হয় দেহ নাও, নয়তো ভাল করে দাও।' অনেকক্ষণ মাটিতে শুয়ে থাকার পর চোখ জুড়ে তন্দ্রা এল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

'তুমি কেন এখানে পড়ে আছ গো?'—সিংহবাহিনী দেবী যেন নিজে এসে তুলে দিলেন সারদামণিকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সারদামণি যেন শুনতে পেলেন, সিংহবাহিনী বলছেন, ওলতলার মাটি খেতে। তাহলেই অসুখ সেরে যাবে।

সারদা উঠে বসলেন। তাঁর সারা শরীরে যেন একটা আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। জননী সিংহবাহিনী তাঁকে ওলতলার মাটি খেতে আদেশ করেছেন। সারদামণি ওলতলার মাটি তুলে খানিকটা মুখে পুরে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যেন আবার শরীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছেন। যাদুমন্ত্রের মত কাজ হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই অসুখ সেরে গেল সারদার।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এই অলৌকিক কাহিনী। গ্রাম্য দেবী সিংহবাহিনীকে জাগিয়ে দিয়েছেন সারদা মা। দেবীর মাহাত্ম্য দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে পড়ল।

মা শ্যামাসুন্দরীর সংসারের অবস্থা তখনও খুবই খারাপ। ছেলেপেলেগুলো তখনও বড় হয়ে ওঠেনি। চাষ-বাসের কাজ দেখাশুনা করার মত কেউ নেই। যজমানী করার মত বয়সও ছেলেদের হয়নি। শ্যামাসুন্দরী দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে তাদের মানুষ করছিলেন।

॥ আ ট ॥

....

জয়রামবাটি গ্রামে প্রতি বছর খুব জাঁকজমক করে কালীপুজো হয়। শ্যামাসুন্দরীও প্রতি বছর কালীর ভোগের জন্য চাল দেন। সংসারে নানা অভাব-অনটন শ্যামাসুন্দরী দেবীর। তবুও তিনি অতি কষ্টে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে কালী পুজোর জন্য চাল সংগ্রহ করলেন।

কিন্তু পূজার কর্তাব্যক্তিরা গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতার বশবর্তী হয়ে পূজার জন্য সংগৃহীত শ্যামাসুন্দরীর চাল গ্রহণ করলেন না। এই আঘাতে আর গ্রামবাসীদের অন্যায় ব্যবহারে শ্যামাসুন্দরীর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি ঘরে বসে সারারাত কাঁদলেন; বললেন, 'কালীর ভোগের জন্য চাল করেছি। এখন এ চাল দিয়ে আমি কি করব?'

সারদামণি সান্ত্বনা দেন শ্যামাসুন্দরীকে। বলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন মা? আমরা তো কোন দোষ করিনি। মা কালী নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ বুঝবেন।'

পরের দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন শ্যামাসুন্দরী দেবী। এক রক্তবর্ণা দেবী দোরগোড়ায় পায়ের উপর পা রেখে যেন বসে আছেন। সেই দেবী সুমিষ্ট স্বরে শ্যামাসুন্দরীকে বললেন, 'তুই কাঁদছিস কেন? তুই যে চাল রেখেছিস—সে চাল আমি গ্রহণ করব। তোর ভাবনা কি?'

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে মা?'

দেবী আকারে ইঙ্গিতে বললেন, 'এর পরেই যাঁর পুজো।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শ্যামাসুন্দরী সারদামণিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে সারদা, লাল মুখ—পায়ের উপর পা দিয়ে বসা—এ কোন দেবীরে সারদা?'

সারদামণি বললেন; 'এত জগদ্ধাত্রী দেবী।' শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'আমি জগদ্ধাত্রী পুজো করব।'

পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গেল। বাড়িতেই যখন পুজো হচ্ছে—তখন আয়োজনটাও একেবারে যৎসামান্য করা যায় না। আরও চালের দরকার। শ্যামাসুন্দরী পাশের বিশ্বাসদের বাড়ি থেকে পাঁচ মণ ধান আনলেন। কিন্তু ধান শুকাবেন কি করে? নেমে পড়ল অঝোরে অবিরাম বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি আর যেন থামতে চায় না। অথচ পুজোর দিন ঘনিয়ে এল।

শ্যামাসুন্দরী আবার কাঁদতে লাগলেন, দেবীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'মা, কি করে তোমার পুজো করব? ধানই যে শুকোতে পারছি না।'

মা জগদ্ধাত্রী যেন শ্যামাসুন্দরীর কথা শুনলেন। হঠাৎ একটুখানি রোদ দেখা দিল। শ্যামাসুন্দরী চাটাইয়ে করে ধান শুকোতে দিলেন। আবার বৃষ্টি শুরু হল। কিন্তু এবার শ্যামাসুন্দরীর বাড়িতে বৃষ্টি নেই। সে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার!

নির্বিঘ্নে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে গেল। আশে-পাশের গ্রামের বিস্তর লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সবাই তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেল।

প্রতিমা বিসর্জনের আগে কানের একটি গয়না খুলে রাখলেন শ্যামাসুন্দরী। তারপর সজল নয়নে প্রতিমার কানে কানে বললেন, 'মা জগদ্ধাত্রী, আগামী বছর আবার এস। আমি সারা বছর ধরে তোমার জন্য যথাসাধ্য জোগাড়-যন্ত্র করে রাখব।'

কিন্তু কিইবা জোগাড় করবেন শ্যামাসুন্দরী? সংসার চালানোই যে দায়।

দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় আর একটি বছর। আবার জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন ঘনিয়ে এল। পুজোটা ভালভাবে করার জন্য সারদামণির কাছে কিছু টাকা চাইলেন শ্যামাসুন্দরী! সারদার বর

যেন খুব উপযুক্ত রোজগেরে লোক! কোত্থেকেইবা টাকা দেবেন সারদা? তিনি কি আর করবেন? তাই বলে ফেললেন শ্যামাসুন্দরীকে, পুজো তো একবার হল। আবার ঝামেলার কি প্রয়োজন?'

সারদামণিও লেগে পড়লেন সংসারের কাজে। গাছ থেকে তুলো তুলে এনে সেই তুলো দিয়ে পৈতা তৈরি করেন। দেখাশুনা করেন চাষবাসের কাজও কিছু কিছু।

এইভাবে কোনক্রমে দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ এল এক দুঃসংবাদ। ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি দিবসে তাঁর রত্নগর্ভা জননী মারা গেলেন। সে সময়ে ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণিদেবী ছিলেন কামারপুকুরে। অসুখে ভুগছিলেন তিনি।

শুনে খুবই ব্যথা পেলেন সারদামণি। চন্দ্রমণিদেবী বড় ভালবাসতেন তাঁকে। সারদামণি ভাবলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবেন।

যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে না নিতেই ধরল ম্যালেরিয়া জ্বরে। জ্বর হতে হতে পেটের পিলে পর্যন্ত বেড়ে গেল।

অনেকে বলল, 'পিলের দাগ দাও। পিলের দাগ ছাড়া পেটের পিলে কমবে না।'

কয়াপাট বদনগঞ্জে গিয়ে পিলে দাগাতে হয়। পিলে দাগানো ব্যাপারটাও একটা বীভৎস ব্যাপার। রোগীকে স্নান করিয়ে শুইয়ে রাখা হয় মাটিতে। তিনচারজন হৃষ্টপুষ্ট লোক রোগীর হাত-পা টেনে ধরে জোর করে, যাতে রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় পালিয়ে যেতে না পারে। হাতুড়ে বৈদ্য একটা জ্বলন্ত কুলকাঠ এনে পেটের উপরে ঘষতে থাকে। এতে রোগীর পেটের চামড়া পুড়ে যায় বলে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকে।

অনেকের কথায় সারদামণি পিলে দাগাতে রাজী হলেন।

শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'এতে যে খুব কষ্ট হবে তোর।'

'কষ্ট হোক, তবুও আমি যাব'—বললেন সারদামণি।

শ্যামাসুন্দরী একদিন কন্যাকে নিয়ে যখন কয়াপাটের বটতলায় উপস্থিত হলেন, তখন সেখানকার শিবমন্দিরের কাছে কিছু লোকের পিলে দাগানোর চিকিৎসা চলছিল। সারদামণি চোখের সামনে সব দেখলেন এবং রোগীদের আর্তনাদও শুনলেন। কিন্তু তিনি তাতে মোটেই বিচলিত হলেন না।

সারদামণি স্নান করে এলেন। শ্যামাসুন্দরী হাতুড়েকে বললেন, 'বাবা, অনেক বেলা হয়েছে। এবার নতুন আগুন করে আমার মেয়েটির পিলে দেগে দাও।'

তিনচারজন জোয়ান লোক এল সারদাকে ধরতে।

সারদামণি বললেন, 'আমাকে ধরতে হবে না। আমি চুপ করে শুয়ে থাকব।'

জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়ে সারদামণির পিলে দেগে দেওয়া হল তিনি 'টুঁ' শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। অমানুষিক যন্ত্রণা নীরবে সহ করলেন।

ম্যালেরিয়ার জন্য ঠাকুরও একবার পিলে দাগিয়েছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, 'যা ভোগ আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল। জগতের সকলের জন্য আমি ভোগ করে গেলাম।'

শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষ যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁরা প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে প্রথমেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন না এগুলোকে তাঁরা নূতনভাবে রূপায়িত করেন। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তাঁরা নিজেদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে জনসাধারণকে এক মহান আদর্শের পথে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কে বলতে পারে হয়তো সারদামণির এই আচরণের পেছনেও নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত ছিল।

রাত্রে সারদা ঘুমিয়ে আছেন। স্বপ্নে দেখা দিলেন তিন জন জগদ্ধাত্রী এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়—জয়া ও বিজয়া।

জগদ্ধাত্রী দেবী সারদাকে বললেন, 'তবে কি এবার পুজো করবিনে ? আমরা তবে যাই।'

'না-না, তোমরা যাবে কেন ? আমারই অন্যায় হয়েছে'। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। তোমার পুজো অবশ্যই হবে'—বললেন সারদা।

সারদামণি ধড়ফড় করে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। এই আশ্চর্য স্বপ্নে তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল।

পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল পুজোর আয়োজন।

অর্থ দিয়ে না পারলেও শ্রম দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি-ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে সারদামণি লেগে পড়লেন পুজোর কাজে।

মায়ের কৃপায় পুজো ভালভাবেই সম্পন্ন হল।

এর পর থেকে প্রতি বছরই জয়রামবাটিতে জগদ্ধাত্রী পুজো হতে লাগল। আর শ্যামাসুন্দরীর সংসারের অভাব অনটনও যেন অনেকটা কমে গেল।

শ্রীমা সারদার এক ভক্ত যোগীন-মা। তিনি জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য কিনে দিলেন সিংহাসন, কাঠের বারকোশ, আরও কতকি। আর কিনে দিলেন তিন বিঘে জমি। সেই জমির আয় দিয়েই পুজো হয় জগদ্ধাত্রীর।

সারদামণিও প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়ে জয়রামবাটি গ্রামে যেতেন। ভক্তজনের বিশ্বাস, জগদ্ধাত্রীই শ্রীমা সারদারূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই দেবী জগদ্ধাত্রী আরাধিতা হলে শ্রীমাও আরাধিতা হন।

॥ নয় ॥

শ্যামাসুন্দরীকে সঙ্গে করে সারদামণি এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ইচ্ছে, মাকে নিয়ে থাকেন কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে।

কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় সেবার শ্রীমায়ের সঙ্গে খুব অভদ্র ব্যবহার করে। সে বলে কিনা, 'কেন এসেছ? কিজন্য এসেছ? এখানে তোমাদের কি প্রয়োজন?'

হৃদয়ের বাড়ি শিহড়ে, শ্যামাসুন্দরী দেবীর বাড়িও শিহড়ে। অথচ হৃদয় শ্যামাসুন্দরী দেবীকে আদৌ মান্য করল না।

ভয়ানক দুঃখ পেলেন শ্যামাসুন্দরী দেবী। বললেন, 'আমরা কি কারুর অংশে ভাগ বসাতে এসেছি?' সারদামণিকে বললেন, 'চল্, আমরা দেশেই ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?'

ঠাকুর সব জানলেন, শুনলেন। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি হৃদয়কে কিছুই বলতে পারলেন না। এতটুকু প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না। এ আবার ঠাকুরের কি রহস্য কে জানে?

মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে সারদামণি মায়ের হাত ধরে দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নিলেন। যাবার সময় সারদামণি ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে দেবীকে প্রণাম করে বললেন, 'মাগো! এবার ঠাঁই দিলেন না। আবার যদি কোনদিন এখানে আনাও, তবেই আসব।'

সারদামণি ফিরে চললেন শ্যামাসুন্দরীকে নিয়ে। রামলাল পাড়ে নৌকা এনে দিল।

সারদামণি বুঝতে পারলেন, হৃদয়ের খুব অহঙ্কার হয়েছে। সে এখন মন্দিরের দায়িত্ব পেয়েছে বলে নিজেকে একটা বিরাট কিছু

বলে মনে করে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৃদয়কেই একদিন ছাড়তে হল দক্ষিণেশ্বরের মন্দির।

এর আগেও হৃদয় কয়েকবার সারদামণির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল। একবার সারদামণির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে সাবধান করে দিয়েছিলেন ; বলেছিলেন, 'ওরে হৃদে ! আমাকে তুই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে আর কখনও এমন কথা বলিসনি। আমার ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস ; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।'

হৃদয়ের পর রামলাল কালীমন্দিরের পূজারী হলেন। তিনিও ঠাকুরকে তেমন দেখা-শোনা করার সুযোগ পেতেন না। ঠাকুরের ভারী কষ্ট হল। ঠাকুর অনেক সময় সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতেন। কেউ এসে যত্ন করে না খাওয়ালে, তিনি খেতেন না। দেবীর প্রসাদ ঘরে শুকিয়ে থাকত।

ঠাকুর কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পাইনকে পাঠালেন জয়রামবাটি। সারদামণির কাছে সংবাদ পাঠালেন তিনি, 'আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে—তুমি অবশ্যই চলে এস—ডুলি করে হোক—পালকি করে হোক—যা টাকা লাগে আমি দেব।'

এই আহ্বানের পর শ্রীমা সারদামণি কি পারেন চুপ করে বসে থাকতে ? তিনি কালবিলম্ব না করে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হলেন।

সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখেন, ঠাকুর ভাবের ঘোরে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতের হাড় ভেঙে ফেলেছেন। তিনি ঠাকুরের ঘরে ঢুকে পুঁটলিটা রেখে ঠাকুরকে প্রণাম করা মাত্র ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কবে রওনা হয়েছ ?'

শ্রীমায়ের কাছ থেকে ঠাকুর জানতে পারলেন যে, 'তিনি বৃহস্পতি-বারের বারবেলায় বাড়ি থেকে রওনা হয়েছেন। তারপরেই এই দুর্ঘটনা।

ঠাকুর বললেন, 'যাও, যাত্রা বদলে এসগে।'

সারদামণি সেই দিনই ফিরে যেতে চাইলেন। ঠাকুর আবার কি মনে করে বললেন, 'আজ থাক, কা'ল যেও।'

পরদিনই সারদামণি যাত্রা বদলাতে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কয়েক দিন জয়রামবাটিতে থেকে ভাল করে দিনক্ষণ দেখিয়ে আবার যাত্রা করলেন সারদামণি। কিছুলোক গঙ্গাস্নানের জন্য কলকাতা যাবার আয়োজন করছিল—সারদামণি তাদের সঙ্গী হলেন। এছাড়া সঙ্গে আছেন ঠাকুরের ভাইপো শিবরাম আর ভাইঝি লক্ষ্মী।

পায়ে হেঁটে যাত্রা। তাই লোকজন বেশি হলেই সুবিধা। পথে নানারকম বিপদের আশঙ্কা আছে।

কথা ছিল, সবাই আরামবাগ গিয়ে রাত্রিবাস করবেন। কিন্তু বেলা আছে দেখে সঙ্গীরা আরও এগিয়ে তারকেশ্বরে রাত্রিবাস করতে চাইলেন।

সামনে কয়েক মাইল তেলোভেলোর মাঠ। সন্ধ্যার পর সেই মাঠে ডাকাতের ভয় আছে। মাঠের মাঝখানে রয়েছে এক ভীষণ দর্শনা কালী মূর্তি। সেই মূর্তির সামনে পুজো দিয়ে ডাকাতরা ডাকাতি করতে বের হয়। তাই ভয়ে কেই সন্ধ্যার পর এই জঙ্গলের ভেতর যাতায়াত করে না।

সন্ধ্যার আগেই এই জঙ্গলটা অতিক্রম করার জন্য সবাই জোরে জোরে পা ফেলে হেঁটে চলল। সবাই যেন একটা অজানা আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠল। সারদামণিও হেঁটে চলেছেন প্রাণপণ। কিন্তু তাঁর পক্ষে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটা দায়। তাঁর শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহও যেন আর চলছিল না। তিনি কিছু দূর খুব জোরে

হাঁটেন, আবার তাঁর গতি মন্থর হয়ে যায়।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারও দ্রুত ঘনিয়ে আসতে লাগল। সারদা-মণির হাঁটার নমুনা দেখে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠল। কারণ সবারই তো প্রাণের ভয় আছে।

সারদামণি সবাইকে বললেন, 'তোমরা এগিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি তোমাদের পিছু পিছু। তোমরা তারকেশ্বরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো।'

একথা শোনামাত্র সবাই দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল। কেউ আর পেছন ফিরে সারদার দিকে তাকিয়েও দেখল না।

দেখতে দেখতে সূর্য চলে গেল অস্তাচলে। তাল বৃক্ষের মাথা থেকে সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়া নেমে এসে মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক রোমাঞ্চকর থমথমে পরিস্থিতি। আর প্রান্তরের অজানা পথ দিয়ে সারদামণি একা একা এগিয়ে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ সারদামণি দেখতে পেলেন এক দীর্ঘাবয়ব মূর্তি যেন তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। মূর্তিটি একটু স্পষ্ট হতেই দেখা গেল, তার গায়ের রঙ ঘোর কালো, কাঁধে একটা বড় লাঠি, হাতে রূপার বলয়। আর মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সারদামণির বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হল না যে, তিনি এবার ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন। যমদূত এখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।

ঝাঁকড়া চুলওয়ালা সেই দুর্দান্ত লোকটি কর্কশ কণ্ঠে হাঁক দিল, 'কে যায় ওখান দিয়ে?' বিস্তীর্ণ জনহীন প্রান্তরে সেই হাঁক প্রতিধ্বনিত হল।

সারদা নির্ভীক অথচ কোমল কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার মেয়ে গো! যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে তোমার জামাইয়ের কাছে। আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে চলে গেছে।''

পেছনে একটি মেয়েকে আসতে দেখে সারদামণি বুঝতে পারলেন,

এটি তাঁরই স্ত্রী। সারদা দৌড়ে গিয়ে ডাকাত-বৌয়ের হাত ছুটো ধরে বললেন, 'মাগো, আমি তোমাদের মেয়ে সারদা। অন্ধকারে কি বিপদেই না পড়েছিলুম। ভাগ্যিস তোমরা এসে পড়েছ তাই রক্ষে।'

যিনি মেয়ে তারই রয়েছে একটা মাতৃরূপ। মেয়ে গৌরীই আবার গর্বিতা হয়েছেন। তেমনি জয়রামবাটির কন্যা সারদা ঠাকুরের মাতৃ-মন্ত্রের উজ্জ্বল বিগ্রহ।

'আমার মেয়ে?'—থমকে গেল সেই বাগদি ডাকাত। সে যেন বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। 'এই জনবসতিহীন অচিন্ত্য বিপদের মাঝখানে আমার কন্যা ঘুরে বেড়াচ্ছেন? অনুর্বর মরুভূমিতে হঠাৎ যেন দেখা দিল সবুজের সমারোহ—জেগে উঠল নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে মমতার মূর্ত বিগ্রহ।

সারদামণিরইবা একি ছুঃসাহস! কই, তিনি তো ভয়ে একটুও ভেঙে পড়লেন না। তিনি শোনালেন এক অমোঘ মন্ত্র—সেই মন্ত্র মাতৃমন্ত্র। যে মন্ত্রে বরফ গলে যায়—বন্ধ্যা হৃদয় মাটিতে জেগে-ওঠে মমতার শ্যামলিমা—সে মন্ত্র, 'আমি তোমার মেয়ে'—কি অপূর্ব আত্মিক নিবিড়তা!

পিতা ও কন্যার হৃদয়ের সম্পর্ক। সেই আত্মার সম্পর্কটুকু তুলে ধরা চাই আন্তরিকতার সুরে। আমরা তো আত্মার সম্পর্ক জানি না। তাইতো আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ—ঈর্ষাপরতন্ত্রতা, পরশ্রী-কাতরতা। আন্তরিকতার স্পর্শে, অকৃত্রিম সরলতায় আমরা যদি পরস্পরকে জানতে শিখতুম, তাহলে আমরা আমাদের দীনতা ক্ষুদ্রতা কাটিয়ে উঠে এক আনন্দময় পরিবেশ রচনা করতে পারতুম। আমাদের চাই আন্তরিকতা আর চাই নির্ভীকতা। নির্ভীক চিত্তে যথার্থভাবে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করা চাই। যে মন্ত্রই শিখিয়েছেন সারদা-মা।

বাগদি ডাকাত এগিয়ে এসে বলল, 'কোথায় জামাই? কি করে সে?'

তিনি দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালী বাড়িতে আছেন—' বললেন সারদামণি।

পতিগৃহ-যাত্রী একটি মেয়ের আন্তরিকতায় তাদের হৃদয়ে যেন হঠাৎ বাৎসল্য রসের সঞ্চার হল।

বাগদি ডাকাত বলল, 'মা তোমার কোন ভয় নেই। চল তুমি আমাদের সঙ্গে।'

করুণাঘন মেয়ের আন্তরিকতায় ভক্ষক আজ রক্ষকে পরিণত হল।

সারদামণি চললেন ওদের পিছু পিছু। ওরা সারদাকে গ্রামের একটি ছোট্ট দোকানে নিয়ে গেল। মুড়ি-মুড়কি কিনে খাওয়ালো রাতের মত। সেই সঙ্গে আশ্রয়। ডাকাত দম্পতির বাড়িতে নির্ভয়ে রইলেন সারদামণি।

বাগদি ডাকাতের বৌ তার আঁচল পেতে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিল বিছানা।

শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে সারদা ঘুমিয়ে পড়লেন। বাগদি ডাকাত সারারাত লাঠি হাতে জেগে পাহারা দিল।

কিসের যাদুমন্ত্রে লুণ্ঠনকারী হয়ে উঠল একজন বিশ্বস্ত প্রহরী! একেই বলে ঈশ্বরীয় প্রেম। অনন্ত প্রেমের অধিকারী হলেই অনন্ত শক্তির অধিকারী হওয়া যায়।

ভোর হতেই আবার শুরু হল যাত্রা তারকেশ্বরেব উদ্দেশ্যে। এবার সারদার সাথে আছে বাগদি ডাকাত ও তার স্ত্রী।

পথে আছে বিস্তীর্ণ কড়াইশুঁটির ক্ষেত। ডাকাত বৌ ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলে সারদামণির হাতে দিতে লাগল। সারদামণি সানন্দে সেই কড়াইশুঁটি খেতে লাগলেন।

তারকেশ্বরে পৌঁছে ডাকাত বৌ বায়না ধরল, সে সারদামাকে রেঁধে খাওয়াবে। কাল রাত্রে সারদা শুধু সামান্য ক'টি মুড়ি-মুড়কি খেয়ে কাটিয়েছেন।

বাবা তারকেশ্বরের পুজো দিয়ে বাগদি ডাকাত চট করে বাজার করে নিয়ে এল। ডাকাত-বৌ রেঁধে দিল স্নেহ ব্যঞ্জন। সারদাকে খাওয়ালো তৃপ্তির সঙ্গে। মেয়ের আকর্ষণে ডাকাত-বৌ চলে এসেছে এতদূর পথ। সেকি মেয়ের টানে এসেছে না কোনও অমোঘ মন্ত্রের টানে? সে মন্ত্র মাতৃমন্ত্র।

তারকেশ্বরে সঙ্গীদের সন্ধান পাওয়া গেল। সঙ্গীরাও সারদাকে দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। ওরা ভাবতেও পারেনি, সারদাকে এমন আনন্দঘন অবস্থায় দেখতে পাবে।

সঙ্গীরা অগণিত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সারদার উদ্দেশ্যে, 'কোথায় ছিলে কাল রাত? তোমার সঙ্গে এরাইবা কারা?'

সারদামণি বললেন, এরা আমার জন্ম-জন্মান্তরের মা-বাবা। মাঠের অন্ধকারে এরা যদি এসে না পড়তেন তাহলে আমার যে কি দুর্দশা হত, তা ভাবতেও পারি না।'

এবার বেজে উঠল বিদায়ের রাগিনী। সবাই বস্তিবাটির দিকে রওনা হল। বাগদি ডাকাত আর তার বৌ কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে। সারদাও ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

চোখের জল মুছতে মুছতে বাগদি ডাকাত বলল, পথে বোঝা বৌ যদি আমার সঙ্গে না থাকত, তবে আমি নিজেই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতুম বাবার কাছে।'

ডাকাত-বৌ এগিয়ে গিয়ে কিছু কড়াইশুঁটি তুলে দিল সারদার আঁচলে। বলল, 'পথে খিদে পেলে খেও।'

সারদামণি ও তাঁর সঙ্গীরা বাঁয়ের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন। বাগদি ডাকাত আর তার বৌ তাকিয়ে রইল অপস্রিয়মান আঁচলের শেষ প্রান্তটির দিকে।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'ডাকাতরূপী নারায়ণ।' পথ চিনে চিনে একদিন বাগদি ডাকাত ও তার বৌ এসে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে। সাথে মোয়া

আর নাড়ু, ওগুলো এনেছে মেয়ে জামাইয়ের জন্য।

'তোমরা আমাকে কেন এত ভালবাস ?'—সারদা জিজ্ঞেস করে-ছিলেন তাদের।

জবাবে বাগদি ডাকাত বলেছিল, 'সেকি গো! তুমিতো সাধারণ মেয়ে নও মা! আমরা যে তোমাকে কালীরূপে দেখলুম।'

সারদা হেসে বললেন, 'সেকিগো ?'

ডাকাত বলল, 'সত্যিই তাই, আমরা তো সেরূপেই দেখেছি। আমরা পাপী বলে তুমি এখন সত্য গোপন করছ।'

'কি জানি বাপু! আমি তো তেমন কিছু বুঝিনা!'—বললেন সারদা হাসিমুখে।

যিনি নিজে ঈশ্বরী, তাঁর বোঝা না বোঝায় কিছু যায় আসে না। যতক্ষণ না বোঝেন ততক্ষণই মানুষী হয়ে বিরাজিতা থাকেন। বুঝলেই তো সিদ্ধি। নিজেকে গুঁটিয়ে নেবেন ধ্যানমগ্না হয়ে। তখন এই মধুর লীলা আর দেখা যাবে না।

সারদামণি নিজেকে বোঝেন নি মানুষের কল্যাণের জন্য, শিক্ষার জন্য। তিনি মানবীরূপেই এক অমানবীয় ধারায় স্নেহ ও সেবার মূর্তি হয়েছিলেন আমাদের সামনে।

ঈশ্বরী যেমন অবতার লীলায় নিজেকে চেনেন না, চিনতে পারেন না তেমনি সব মানুষও তাঁকে বুঝে ওঠে না। দেখতে পায় না তাঁর প্রকাশ। যাঁর দেখবার সত্যিকারের চোখ আছে, সেইতো দেখতে পায়। সেজন্য চাই শুদ্ধাভক্তি—চাই অন্তর্দৃষ্টি।

॥ দশ ॥

....

ঠাকুর একদিন সারদামণিকে ডেকে বললেন, 'তোমার জীবনের পূর্ণ সফলতার জন্যে প্রয়োজন এখন দীক্ষা নেবার।'

শ্রীমা বললেন, 'আমি তো তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। এবার দাও আমাকে দীক্ষা।'

ঠাকুর কিন্তু শ্রীমাকে নিজে দীক্ষা দিলেন না। বললেন, 'শক্তিমন্ত্রে তোমাকে দীক্ষা নিতে হবে। তোমাকে দীক্ষা দেবে পূর্ণানন্দ এই আমার ইচ্ছা।'

সারদামণি স্বামী পূর্ণানন্দের কাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ঠাকুরও সারদামণির জিহ্বায় একটি বীজমন্ত্র লিখে দিলেন। এঁকে দিলেন কুলকুণ্ডলিনী চক্র।

নহবতের পশ্চিমের বারান্দায় বসে দক্ষিণমুখী হয়ে জপ করেন সারদামণি। মাঝে মাঝে তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, চাঁদের জ্যোৎস্না কত নির্মল, কত স্নিগ্ধ। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন, 'হে ঈশ্বর! চাঁদের জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও। কিন্তু চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। আমার অন্তরে যেন কোন প্রকার কলুষতা না থাকে।'

সারদামণির একখানা ফটো বাঁধাই হয়ে এসেছে। একজন মায়ের হাতে ফটোটা তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখুনতো মা, ফটোটা কেমন হয়েছে?'

শ্রীমা তখন ফটোটা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। সবাই হেসে উঠল। একজন রসিকতা করে জিজ্ঞেস করল, 'ফটোখানি কার মা?'

'কেন, আমার?' —বললেন সারদামণি। সবাই আবার হেসে উঠল।

'তোমরা হাসছ কেন?' হাসির কারণ বুঝতে না পেরে শ্রীমা অবাক হয়ে তাকালেন ওদের দিকে।

'আপনি নিজের ছবিকে নিজেই প্রণাম করলেন, এ কেমন ব্যাপার হল?'—একজন বলে উঠল।

শ্রীমা তখন হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'আরে ওর মধ্যেও যে ঠাকুর আছেন।'

যোগীন-মা যাচ্ছিলেন পঞ্চবটীর দিকে। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিস্থা হয়ে বসে আছেন শ্রীমা সারদামণি। যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

তবুও কি মায়ের তৃপ্তি আছে? একদিন যোগীন-মাকে বললেন সারদামণি, 'ওনাকে আমার কথা একটু বলতে পার?'

যোগীন-মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি কথা আবার বলব?'

'যাতে আমার একটু ভাব-টাব হয়। ভক্তদের জন্য যেতে পারি না ওঁর কাছে। তুমি তে সব সময়েই যাও। একটু বলে দেখ না আমার জন্য'—বললেন সারদামণি।

যোগীন-মা বললেন, 'এ আর বেশি কথা কি।'—বেশ বলব আমি।

একদিন সকালবেলা ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে। যোগীন-মা প্রণাম করে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'কি গো কি খবর?' —স্মিত হাস্যে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর যোগীন-মাকে।

সাহস পেয়ে যোগীন-মা শ্রীমার আর্জি পেশ করলেন। বললেন, 'উনি চান ওঁর একটু ভাব-টাব হোক।'

ঠাকুর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর করুণাঘন স্নিগ্ধ মুখে

একি কঠিন ঔদাসীন্য! বিব্রতবোধ করলেন যোগীন-মা। আর কথা বাড়াবার সাহস পেলেন না। হয়তো কথাটা বলে তিনি কিছু একটা অন্যায় করেছেন। তাই কোন রকমে আর একটা প্রণাম সেরে পালিয়ে এলেন সেখান থেকে।

যোগীন-মা নহবতে ফিরে এসে দেখেন শ্রীমার ঘরের দরজা বন্ধ। সারদামণি পুজোয় বসেছেন। দরজার একটুখানি ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন যোগীন-মা। একি কাণ্ড! সারদামণি যে হাসছেন আপন মনে। আবার পর মুহূর্তেই কাঁদছেন অঝোরে। যেন বর্ষার ধারা নেমেছে চোখ দিয়ে। আবার খানিকক্ষণ বাদে হাসি-কান্না সব বন্ধ। সারদা-মা তখন গাঢ় সমাধিতে নিমগ্না—যেন তিনি একেবারে তন্ময়তার কবিতা।

দরজার বাইরে খুব সন্তর্পণে অপেক্ষা করতে লাগলেন যোগীন-মা।

মায়ের পুজো শেষ হতেই যোগীন-মা ঘরে ঢুকলেন। বললেন সারদামণিকে, 'তুমি না বলেছিলে তোমার ভাব-টাব হয় না?'

সারদামণি লজ্জিত হলেন। তিনি ধরা পড়ে গেলেন যোগীন-মার কাছে। হেসে ঢাকতে চাইলেন সে লজ্জা। এ লজ্জা তো কলঙ্কের নয়—এ লজ্জা তো মহত্বেরই প্রকাশ।

একদিন বলরাম বোসের বাড়ির ছাদে ধ্যান করতে করতে শ্রীমা সমাধিস্থা হয়ে পড়লেন। সমাধি ভাঙলে তিনি বললেন, 'দেখলুম কোথায় যেন চলে গেছি। সেখানে আছেন ঠাকুর। কারা যেন আমাকে আদর-যত্ন করে এনে বসাল ঠাকুরের পাশে। সে যে কি আনন্দ তা বলে প্রকাশ করা যায় না। একটু হুঁশ হতে দেখি, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, ওই বিশ্রী শরীরটার মধ্যে কি করে আবার ঢুকি?'

আরেক দিনের ঘটনা। শ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে ছিলেন তখন। একদিন সেখানে বসে তিনি ধ্যান করছিলেন। পাশে

যোগীন-মা, গোলাপ-মা এরাও ধ্যানে মগ্ন। হঠাৎ শ্রীমা চীৎকার করে উঠলেন, 'ওরে যোগীন, আমার হাত কোথায়, পা কোথায়?'

যোগীন-মা, গোলাপ-মা এঁরা ছুটে এসে দেখেন শ্রীমা সমাধিস্থা, মন তখন চলে গিয়েছিল স্থূল জগৎ থেকে এক ভাবময় রাজ্যে।

এঁরা শ্রীমায়ের হাত-পা টেনে টেনে বলতে লাগলেন, 'এই যে তোমার হাত, এই যে তোমার পা।'

এরপর ধীরে ধীরে ফিরে এল দেহবুদ্ধি। এরই নাম নির্বিকল্প সমাধি। চির নেপথ্যে বাস করে শ্রীমা পেলেন উচ্চতম উপলব্ধির আস্বাদ। শ্রীমা তো ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী সাজেন নি। সংসারে ।কটি সলজ্জ বধূ থেকেই প্রমাণ করে দিলেন সংসারে থেকেও উচ্চতম পলব্ধির আস্বাদন সম্ভব। সংসারী মহিলাদের কাছে এটা একটা ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও শ্রীমা সারদামণিকে খুব সম্মান করতেন। ীমা খাবার নিয়ে ঠাকুরের ঘরে গেলে তিনি 'মা ব্রহ্মময়ী' বলে চীৎকার রে উঠতেন। একদিন এক কাণ্ড ঘটল। শ্রীমা ঠাকুরের ঘরে ঢুকে াবার বেরিয়ে এলেন।

ঠাকুর চোখ বুজে ঈশ্বরের চিন্তা করছিলেন। চোখ বুজেই তিনি ঠাৎ বলে ফেললেন, 'দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।'

শ্রীমা উত্তর দিলেন 'আচ্ছা, তাই হবে।'

ঠাকুর শ্রীমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই ব্যাকুলভাবে তাড়াতাড়ি লতে লাগলেন, 'তুমি কিছু মনে করো না, আমি ভেবেছিলাম অন্য কানো লোক।'

পরের দিনও ঠাকুর নহবতে এসে হাজির। তিনি যেন ব্যাপারটা ্লতে পারছিলেন না। তাই শ্রীমাকে বলতে লাগলেন, 'ছাখো, ারারাত ভেবে ভেবে আমার ঘুম হয়নি। কেন যে আমি অন্যমনস্ক য়ে তোমাকে এরকম কথা বলে ফেললুম!'

দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সমাগম লেগেই আছে। অনেকে ঠাকুরের জন্য ফল, মিষ্টি এসব নিয়ে আসেন। ঠাকুর সেগুলো শ্রীমায়ের কাছে নহবতে পাঠিয়ে দেন। শ্রীমা আবার সেগুলো ভক্তবৃন্দ ও পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। একদিন তাঁকে সব ফল মিষ্টি বিলিয়ে দিতে দেখে গোপালের মা বলে উঠলেন, 'তুমি আমাদের ঠাকুরের জন্য কিছু রাখলে না?'

শ্রীমা তখন সত্যি সত্যিই খুব বিব্রতবোধ করতে লাগলেন তাই তো ঠাকুরের জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই এক ভদ্রমহিলা অনেকগুলো সন্দেশ নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে শ্রীমায়ের হাতে সন্দেশগুলো তুলে দিলেন। শ্রীমাও যেন উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন।

একদিন শ্রীমা ঠাকুরের ঘরে গেছেন। ঠাকুর যেন অনুযোগের সঙ্গে শ্রীমাকে বললেন, 'তুমি এত খরচ করে ফেললে কিভাবে চলবে?'

একথা শুনে শ্রীমা মুখে কোন কথাই বললেন না। সোজা চলে গেলেন নহবতের ঘরে।

ঠাকুর এতে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রামলালকে ডেকে বললেন, 'যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে আমার যে সব শেষ হয়ে যাবে।'

একি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীর প্রতি সহজাত ভালবাসা, না মাতৃত্বশক্তির কাছে অবনত হওয়া!

॥ এগারো ॥

···

াানিহাটিতে বৈষ্ণবদের উৎসব হচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী ত়থিতে প্রতি বছরই বিরাট উৎসব হয় সেখানে।

সেই উৎসবে যাবেন ঠাকুর। সঙ্গে যাবেন স্ত্রী পুরুষ অনেক ভক্তের দল। চারখানা পানসি নৌকো ভাড়া করা হয়েছে।

একজন স্ত্রী ভক্ত এসে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরকে, 'মা যাবেন না আমাদের সঙ্গে ?'

ঠাকুর কি রকম উদাসীনের মত বললেন, 'ওর ইচ্ছে হয় তো চলুক।'

এই কি ঠাকুরের মন খুলে অনুমতি দেওয়া ? এটাই কি তাঁর আনন্দ আহ্বান ? নিশ্চয়ই নয়। যদি তিনি মন খুলে অনুমতি দিতেন তবে নিশ্চয়ই বলতেন, 'সেও যাবে বৈকি আমাদের সঙ্গে।'

'তেমন আহ্বান নেই যখন ঠাকুরের, তখন আমার গিয়ে কাজ নেই' —সারদামণি চিন্তা করলেন। একজন স্ত্রী ভক্তকে ডেকে বললেন তিনি, 'অনেক ভিড় হবে। এত ভিড়ে গিয়ে আমার কাজ নেই। কিছুই দেখা হবে না আমার। তাই আমি যাচ্ছি না।'

পানিহাটিতে যাবার যে বাসনা সারদার মনে জেগেছিল, তাও ত্যাগ করতে হল। কিন্তু মনে কোন অভিমানই রাখলেন না তিনি।

পানিহাটি থেকে ফিরে এলেন ঠাকুর। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে সবাইকে বললেন, 'ও না গিয়ে ভালই করেছে। ও বুঝে-সুঝেই যায়নি। ওর দারুণ বুদ্ধি!'

ভক্তেরা সবাই তাকিয়ে রইলেন ঠাকুরের দিকে। তারা বুঝতে

পারে নি তিনি কি বলতে চাইছেন।

ঠাকুর যখন সবাইকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, 'ভক্তের দল যখ আমার সঙ্গে যায়, তখন লোকেরা বলতে থাকে পরমহংসের ফৌজ চলেছে। এখন ও সঙ্গে থাকলে সবাই ঠাট্টা করে বলবে ঐ দেখ, হংস-হংসী যাচ্ছে।'

একজন বৃদ্ধা মহিলা আসেন সারদামণির কাছে। নহবতের নিভৃতে বসে গল্প-গুজব করে কাটিয়ে যান।

ঠাকুরের কানে পৌঁছল সে কথা। তিনি মাকে বললেন, 'কি এত কথা ওর সঙ্গে?'—ঠাকুর বিস্ময় প্রকাশ করেন।

মহিলাটির অতীত জীবনে ছিল কলঙ্কের দাগ। ওর সঙ্গে সারদামণির গল্প-গুজব ঠাকুর পছন্দ করতেন না। একদিন তো ঠাকুর সারদামণিকে বলেই ফেললেন, 'আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি ওর সঙ্গে বসে গল্প কর।'

ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমায়ের এইখানেই দ্বন্দ্ব। পিতা কলঙ্কিনী কন্যাকে ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু স্নেহময়ী মা কি করে কন্যাকে পরিত্যাগ করেন? পিতা এবং মাতার মধ্যে তফাৎ তো এখানেই।

শ্রীমা বলেছিলেন, 'আমি কি শুধু সতের মা? আমি সত্যের মা তাই, তিনি শুধু সতের মা নন, তিনি অসতেরও মা। তাইতে কলঙ্কিনী কন্যার প্রতি মায়ের অকৃপণ কৃপা।

একদিন তো যোগীন-মার চক্ষুস্থির। ঠাকুর নিষেধ করে দেবা পরও সেই মহিলাটি সারদামণির কাছে আসছে। সে সারদামণিকে 'মা' বলে ডাকে। আর সারদামণিও তাকে খেতে দেন। মাঝে মাঝে আদর করে ওর সঙ্গে গল্প-গুজবও করেন। মহিলাটি এর চেয়ে শীতল ছায়া আর কোথায় পাবে? তাইতো মহিলাটির মনে অপার শান্তি।

ঠাকুর নিজেও একদিন সব দেখে ফেললেন। কিন্তু এ নিয়ে শ্রীমার সঙ্গে আর কোন কথাই বললেন না। ঠাকুর হার মানলেন

কিন্তু কার কাছে? মাতৃত্বের গভীরতার কাছে। মাতৃস্নেহের অপূর্ব স্পর্শে কলঙ্কিনী কন্যাও মহিমময়ী হয়ে উঠতে পারে।

তারাসুন্দরী মাঝে মাঝে আসেন শ্রীমার কাছে। তিনি একজন নাম করা অভিনেত্রী। তারাসুন্দরী এসে মাকে প্রণাম করে যান। মা প্রাণভরে ওকে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু তারাসুন্দরীরই কি কম সঙ্কোচ! কিছুতেই মায়ের পা স্পর্শ করবে না। বারান্দায় মাথা ঠুকে প্রণাম করেন মাকে। শ্রীমা শালপাতায় করে ওকে প্রসাদ দেন। তারাসুন্দরী নিজেই এঁটো পাতা ফেলে দিয়ে আসেন। শ্রীমা পান সেজে দিলে তারাসুন্দরী আলগোছে মায়ের হাত থেকে পান নেন, যেন মায়ের হাত ছুঁয়ে না ফেলেন।

নিজেকে এমনি করে দীনতায় ক'জন নিয়ে আসতে পারেন? যাঁরা পারেন, তাঁরাই তো মহৎ। তাঁদের ভক্তিই তো আদর্শে সমুজ্জ্বল। তারাসুন্দরী সম্পর্কে একদিন শ্রীমা বললেন, 'ওর মন খুবই পবিত্র। যেটুকু ঈশ্বরকে ডাকে, মনে-প্রাণে ডাকে।'

একদিন এক পাগলী এসে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে। সে এসে বলে কিনা, সে ঠাকুরের মধুর ভাবের সাধন সঙ্গিনী। শুনে ঠাকুর তো একেবারে চটে লাল। পাগলীকে একটা কড়া ধমক লাগিয়ে বার করে দিতে চাইলেন।

নহবতখানার বন্দীশালা থেকে সবই লক্ষ্য করলেন সারদামণি। মনে ভারী কষ্ট হল তাঁর। মনে হল যেন, তাঁর নিজের সন্তানকেই তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

গোলাপ-মাকে ডেকে পাঠালেন সারদামণি। গোলাপ-মা এলে বললেন, 'যাও, পাগলীকে এখানে ডেকে নিয়ে এস। ও যদি কিছু অন্যায় করে থাকে, তবে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়।'

পাগলী মেয়ের প্রতি মায়ের কি অপার করুণা।

গোলাপ-মা ধরে নিয়ে এল পাগলীকে শ্রীমায়ের কাছে। আদর

করে কাছে টেনে এনে বসালেন, বললেন, 'উনি যখন তোমাকে দেখলেই চটে যান, তবে তুমি ওঁর কাছে যাও কেন?'

ঠাকুরের নির্দেশ—রাতে বাবুরাম চারখানা করে রুটি খাবে। প্রত্যেকের ধাত বুঝে বুঝে ঠাকুর ভক্তদের খাবারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

একদিন ঠাকুরের মুখোমুখি হতেই ঠাকুর ধরলেন বাবুরামকে। 'কিরে বাবুরাম, রাত্রে ক'খানা করে রুটি খাচ্ছিস?'—'ঠাকুর জিজ্ঞেস করে বসলেন বাবুরামকে।

বাবুরাম অপরাধীর মত একেবারে নুয়ে পড়ল। সে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বললে, 'পাঁচ-ছ'খানা হবে।'

'তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করে বেশি বেশি খাচ্ছ কেন?'—ঠাকুর একেবারে গর্জে উঠলেন।

বাবুরাম সাহস করে বলে ফেলল, 'তা আমি কি করব? মা দেন বলেই তো খাই।'

জবাবদিহি নিতে ঠাকুর তক্ষুণি চলে গেলেন নহবতে। শ্রীমাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বেশি বেশি খাইয়ে ছেলেগুলোর মাথা নষ্ট করছ কেন?'

শ্রীমা প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'দু'খানা রুটি বেশি খেয়েছে বলে তোমার এত দুশ্চিন্তা! ছেলেদের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না—সে আমিই ভাবব। ওরা দু'খানা রুটি বেশি খেলে তুমি ওদের কিছু বলো না লক্ষ্মীটি!'

মার উত্তর শুনে ঠাকুর অবাক। অ্যাঁ! এ বলে কি! ছেলে-গুলোর খাওয়ার ব্যাপারে আমি কিছু বলব না। শ্রীমা দাঁড়ালেন না। সরে গেলেন। তাঁর বলায় এমন একটা সরলতা ফুটে উঠল যে তা দেখে ঠাকুরের সব ক্রোধ একেবারে জল হয়ে গেল। জবাবদিহি করতে এসে তিনি নিজেই বিব্রত হয়ে পড়লেন।

বরাভয়দাত্রীর কাছে ঠাকুর পরাজয় বরণ করে নিয়ে উচ্চরোলে হেসে উঠলেন।

ঠাকুরের অসুখ হল। কবরেজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এসে ঠাকুরের জলপান পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। ঠাকুর শ্রীমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁগো, জল না খেয়ে কি পারব?'

শ্রীমা বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবে।'

ঠাকুর আবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। বললেন, 'কোবরেজ বেদানার জল পর্যন্ত পুঁছে দিতে বলেছে।'

শ্রীমা বললেন, 'মা কালীর ইচ্ছাতেই সব হবে।'

ঠাকুর শেষ পর্যন্ত জলপান ছেড়ে ঔষধ খেতে লাগলেন।

ঠাকুরের জন্য দুধের বরাদ্দ করা হয়েছে। আধসেরখানেক দুধ খেতে হবে। কিন্তু রোজ গয়লা সেধে সেধে বেশি দুধ দিয়ে যায়। বলে, 'মন্দিরে দিলে ব্যাটারা কালীর ভোগ বলে বাড়ি নিয়ে যাবে; আর এখানে দিলে ঠাকুর খাবেন।'

শ্রীমা জ্বাল দিয়ে দিয়ে দুধ কমিয়ে দেন। আর সন্দেশ রসগোল্লা তৈরি করে মাঝে মাঝে গোয়ালাকে খাওয়ান।

ঠাকুর একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কতটুকু দুধ?'

শ্রীমা ঘন দুধের কথা চিন্তা করেই বললেন, 'কত আর হবে! এক-সের-পাঁচপো হবে আর কি!'

ঠাকুরের সন্দেহ হল। তিনি আবার বললেন, 'এইযে পুরু সর দেখা যাচ্ছে!'

শ্রীমা ঠাকুরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঘন দুধ সবটাই খাওয়ালেন। বুঝতে দিলেন না আসলে কতটা দুধ।

ব্যাপারটা ঠাকুর ভুলে যান নি। তাই একদিন ঠাকুরের খাবারের সময়ে কাছে ছিলেন গোলাপ-মা। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'হ্যাঁগা, কত দুধ হবে বলতে পার?'

গোলাপ-মা ব্যাপারটা জানতেন না। তাই তিনি গোপন না করে দুধের পরিমাণটাই বলে দিলেন।

ঠাকুর একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এ্যাঁ এত দুধ! এবার বুঝেছি। তাইতো আমার পেটের গোলমাল চলছে।'

সারদামণির ডাক পড়ল তৎক্ষণাৎ। ঠাকুর আবাব জিজ্ঞেস করলেন, 'কতটুকু দুধ দিয়েছ?'

গোলাপ-মা কি বলেছেন তা শ্রীমা জানেন না। তাই আগের মতই বললেন, 'কত আর হবে! এই ধর পাঁচপো!'

তাই শুনে ঠাকুর বলে উঠলেন, তবে যে গোলাপ বললে এত দুধ।'

এবার মার কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন গোলাপ মায়ের কথায় ঠাকুর সন্দেহ করেছেন দুধের পরিমাণ নিয়ে। কিন্তু বাইরে ঘাবড়ালেন না শ্রীমা। তিনি মিথ্যাকেই আশ্রয় করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এখানকার মাপ গোলাপ মা জানে না। ঘটিতে কত দুধ ধরে তা গোলাপ মা জানবে কি করে? আর দুধ খাবে তো, ক'ছটাক—ক'পো—এত হিসাব কেন?'

'কাউকে তৃপ্তি করে খাওয়াবার জন্য মিথ্যে কথা বললে দোষ হয় না'—বলেছিলেন সারদামণি। তাই তিনি সবাইকেই ভুলিয়ে-টুলিয়েই এভাবেই খাওয়াতেন, যেমনি করে প্রতি মা প্রীতিভরে নিজের সন্তানদের খাওয়ান।

॥ বার ॥

লোহার খাঁচার মধ্যে একটা টিয়াপাখি। পোষা; সারদামণির সঙ্গী। সারদামণি তার নাম রেখেছেন গঙ্গারাম। গঙ্গারামকে তিনি নাম শেখান। গঙ্গারাম 'মা-মা' করে ডেকে ওঠে। বন্ধ খাঁচায় পাখিটা ক্ষোভে পাখা না ঝাপটিয়ে 'হরিকথা' বলে।

খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে শ্রীমা খেতে দেন পাখিটিকে প্রসাদী নৈবেদ্য। খাওয়া-দাওয়া সেরে একদিন পান খাচ্ছেন সারদামণি। গঙ্গারাম পান খাবার লোভে শ্রীমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। মা পানশুদ্ধ নিজের জিভটি বাড়িয়ে দিলেন খাঁচার দিকে। অমনি গঙ্গারাম ঠোঁট বাড়িয়ে মায়ের জিভ থেকে পানটুকু তুলে নিল।

একদিন ঠাকুরের পুজো তখনও আরম্ভ হয়নি। নৈবেদ্য থেকে খানিকটা মোহনভোগ তুলে নিলেন শ্রীমা। তুলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে গঙ্গারামের খাঁচার সামনে ধরলেন। গঙ্গারাম ওমনি মায়ের হাত থেকে ঠোঁট বাড়িয়ে মোহনভোগ খেতে লাগল।

ব্যাপারটা দেখে অনেকেই সোচ্চার হয়ে উঠল। সমালোচনা হতে লাগল। একি অনাসৃষ্টি! পুজো হয়নি—এর আগেই নৈবেদ্য থেকে মোহনভোগ দিয়ে দিলেন শ্রীমা। তিনি কিন্তু অবিচলিত। প্রতিবাদের ঝড়ের মুখে মা'র মুখে সামান্য স্নিগ্ধ হাসি। বললেন, 'ওর ভেতরেই ঠাকুর আছেন যে!'

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের সংসারে ছিল এক ঝি। নাম বৃন্দে ঝি। যন্ত্রণাও কি সে কম দিয়েছে সারদামণিকে। তার উৎপাতের শেষ নেই। একদিন নহবতে বসে শ্রীমা ধ্যান করছিলেন। বৃন্দে ঝি কি

কারণে গোঁসা করে একটা কাঁসি ছুঁড়ে ফেলল শ্রীমায়ের সামনে। ইচ্ছে করেই করল কাজটা। যেন সে ভাবের ঢং এর নিকেশ করে দিতে চায়।

ধ্যানে বসে শ্রীমার বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। তিনি চেয়ে দেখলেন ব্যাপারখানা। এই অভাবনীয় ঘটনায় তিনি কেঁদে ফেললেন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বৃন্দে ঝির গোনাগুনতি লুচি চাই। বরাদ্দের লুচিতে টান পড়েছে—তাইতে এত রাগ। হয়তো সেদিন অনেক লোকজনের সমাগম হয়েছিল। তাই সবাইকে দিতে গিয়ে বৃন্দে ঝির বরাদ্দে টান পড়েছে।

ঠাকুর নিজেও কি কম ভয় পেতেন বৃন্দে ঝিকে। একদিন বাইরে থেকে কিছু ছেলে এসে পড়ায় বৃন্দে-ঝির লুচিতে টান পড়েছে। অমনি শুরু হয়ে গেল ওর গালাগালি।

পাছে ছেলেরা বৃন্দে-ঝির গালাগালি শুনে ফেলে—তাতে আবার ঠাকুরের ভয়। তাই সেদিন অপরাধীর মত তিনি এসে হাজির হলেন নহবতের সামনে। সারদামণিকে ডেকে বললেন, 'ওগো, বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেছে—এখন উপায় ?'

সারদামণি বৃন্দে-ঝিকে কত করে বোঝালেন—'তুমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা কর। তোমাকে আবার লুচি ভেজে দিই।' কিন্তু কে শোনে কার কথা। বৃন্দে-ঝি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে আবার গালাগালি শুরু করে দিল।

সারদামণি ধীরস্থিরভাবে বোঝালেন বৃন্দে ঝিকে। বললেন, 'তৈরি খাবার যখন নেবে না, তবে তোমার জন্য সিধে সাজিয়ে দিই। এই কথায় বৃন্দে-ঝি শান্ত হল।

সেই দুর্দান্ত বৃন্দে-ঝিই এসে শ্রীমাকে একদিন খবর দিল, 'ঠাকুর তোমাকে ডাকছেন।'

শ্রীমা যেন একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। আবার কি অপরাধ করে

ফেলেছেন বৃন্দে-ঝি'র কাছে। কে জানে ? ও হয়তো ঠাকুরের কাছে গিয়ে নালিশ করে থাকবে।

'আরে এত ভাবছ কি ? কি মালাই যে দিয়েছ কালী-ঠাকরুণের গলায়, তাই দেখে ঠাকুর তো আনন্দে একেবারে আত্মহারা। ঠাকুরের ইচ্ছা, তুমি এসে একবার দেখে যাও ব্যাপারখানা।' ব্যাপারটা খুলে বলল বৃন্দে-ঝি।

রঙ্গন আর জুঁই ফুল দিয়ে মালা গেঁথেছিলেন সারদামণি। সেই মালা মাকে পরাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন মন্দিরে। পূজারীর সহ-কারীরা মা'কে সাজাবার সময়ে সব গয়না খুলে রেখে দেবীকে শুধু ফুলের মালা দিয়ে সাজাল। তা দেখে ঠাকুরতো ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে গেলেন।

'কালো রঙে মাকে কি সুন্দর মানিয়েছে এই মালায়'—বললেন ঠাকুর।

'এই মালা কে গেঁথেছে রে ?'—জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কে আবার হবে ? যাঁর মালা তিনিই গেঁথেছেন'—বলল একজন রসিকতা করে।

'যাও, তাঁকে একবার মন্দিরে নিয়ে এসোগে। একবার দেখে যাক মালা পরে মায়ের রূপ কি খুলেছে।'

ঠাকুরকে দেখার সুযোগই হয় না সারদামণির। তবুওতো এবার একটা সুযোগ ঘটল।

তিনি থাকেন ভক্তবৃন্দ নিয়ে তাঁর ঘরে। মা থাকেন নবতের খাঁচায়।

সারদামণি মন্দিরের দিকে চললেন। তখনও তিনি সহজে কারো সামনে বের হন না। তিনি দেখলেন, মন্দিরের দিকে বলরাম ও সুরেশ এগিয়ে যাচ্ছে। লজ্জাশীলা শ্রীমা আর লুকোবার পথ পেলেন না। শেষ পর্যন্ত বৃন্দে-ঝির আঁচল টেনে নিলেন।

মন্দিরের পেছনের দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়েই বাধা পেলেন। ঠাকুর দেখে ফেলেছেন। বললেন, 'ওদিকে উঠো না—পড়ে যাবে। সামনের সিঁড়ি দিয়েই এস।'

বলরামরা টের পেয়ে সরে গেল। শ্রীমা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে চলে গেলেন।

সারদামণি তাকিয়ে রইলেন কালীমূর্তির দিকে। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড! কালীর মুখের ওপর পরিষ্কার দেখতে পেলেন ঠাকুরের মুখ আঁকা রয়েছে। তাঁর হাতে গাঁথা মালা কি তবে দুলছে ঠাকুরেরই গলায়। ঠাকুর আর মা কালী কি অভিন্ন। সারদামণি চিন্তা করতে লাগলেন। ঠাকুর কি এই দৃশ্য দেখবার জন্যই, তিনি আর মা কালী উভয়ে এক তাই বোঝাবার জন্যই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন! ভাবতে ভাবতে গভীর তন্ময়তার মধ্যে মা ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

॥ তেরো ॥

একদিন লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক ধনী মারোয়াড়ী এলেন ঠাকুরকে দর্শন করতে। ঠাকুরকে দেখে তিনি ভাবে একেবারে আপ্লুত হয়ে গেলেন। কি করবেন ভেবে পেলেন না। শেষে ঠাকুরের কাছে বললেন, 'আপনার সেবার জন্য আমি দশ হাজার টাকা দিতে চাই।'

ঠাকুর খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'এখানে এসে টাকা-পয়সার কথা বলো না। যদি বলতে চাও, তবে এখানে এস না।'

লক্ষ্মীনারায়ণ তো অবাক হয়ে গেলেন। এত টাকা হাতে পেয়েও কি কেউ কখন তা অবহেলায় ঠেলে দেয়। লক্ষ্মীনারায়ণ ভাবলেন, আবার সাধলে হয়ত ঠাকুর নেবেন। তাই তিনি আবার ঠাকুরকে বললেন, 'বাবা! আমি তো খুশি মনেই টাকাটা দিচ্ছি।'

ভয়ানক রেগে গেলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার ওই টাকা আমি স্পর্শও করব না।'

লক্ষ্মীনারায়ণ একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। একি ব্যাপার! ঠাকুর তার দেওয়া টাকা নিতে চান না কেন? তিনি আবার অনুনয়ের সুরে বললেন, 'ঠাকুর! আপনি টাকাটা না নিলে আমি মনে খুব ব্যথা পাব।'

ঠাকুর কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'যাও, মায়ের কাছে যাও। ওঁর যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে টাকাটা নেবে।'

লক্ষ্মীনারায়ণ এসে হাজির হলেন সারদামণির কাছে। সারদামণি

বললেন, 'উনি যেখানে নেন নি, আমি কি হাত পেতে নিতে পারি এই টাকা! আমার নেওয়া যা, ওনার নেওয়াও তা।'

ঠাকুর জানতে পারলেন সারদামণির জবাব। খুব খুশি হলেন তিনি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমি জানতুম ও টাকা নেবে না, তবুও ওঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখলুম।'

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সারদামণি। প্রমাণিত হল ইনিই ঈশ্বরী শুদ্ধবোধস্বরূপা।

বলরাম আসেন ঠাকুরের কাছে। বড় ভক্ত তিনি। ঠাকুর ওর প্রতি স্নেহ ভালবাসা উজার করে দেন।

ঠাকুর খবর পেলেন বলরামের স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ করেছে। ঠাকুর ডেকে পাঠালেন সারদামণিকে। বললেন, 'যাও, একবার দেখে এসগে বলরামের স্ত্রীকে।'

সারদামণি শুধু একটুখানি কুণ্ঠাভরে বললেন 'যাব কি করে?'

অমনি ঠাকুর প্রায় গর্জন করে বলে উঠলেন, 'বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি একবারটি যেতে পারবে না? দরকার হলে হেঁটে যাবে।'

একি সারদামণির অনিচ্ছা? না, অবশ্যই নয়। তবে এতদূর পথ একা একা হেঁটে যাবেন কি করে?

হেঁটে আর যেতে হল না। কোথা থেকে এসে হাজির হল এক পালকি—যেন ঈশ্বরই জুগিয়ে দিয়েছেন। মায়ের স্পর্শে বলরামের স্ত্রী শান্তি পেলেন।

একদিন বারান্দায় বসে আছেন সারদামণি। কোত্থেকে একটি ভিখিরী মেয়ে এসে মাকে প্রণাম করল। কেউ কেউ মাকে প্রণাম করে প্রণামী দেন। ও ভিখারী মেয়ে। ওর কি আর দেবার আছে? ওর হাতে একটি পেয়ারা। বলল শ্রীমাকে, 'আজ ভিক্ষে করে এই পেয়ারাটি পেয়েছি। তাই এনেছি তোমার জন্যে। এই সামান্য পেয়ারা

দেবার মত সাহস আমার নেই। তবুও তুমি গ্রহণ করলে আমি ধন্য হব।'

হাত বাড়িয়ে শ্রীমা পেয়ারাটি নিলেন। নেবার সময়ে বললেন, 'তোমার সংকোচ কিসে? ভিক্ষার জিনিস খুবই পবিত্র। আমি নিশ্চয়ই খাব তোমার পেয়ারা। ঠাকুরও পেয়ারা খেতে খুব ভালবাসেন।'

এতটুকুন একটি ভিখিরী মেয়ে। ওর প্রত্যাশাই বা কি? ও আজ প্রত্যক্ষ করল মধুময়ী মহামায়াকে। তাইতো তার চোখে আজ জল। আনন্দে ঝিকমিক করছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠাকুর একদিন হাজির হলেন নহবতে—সারদামণির ঘরে। এত ঠাকুরের ব্যতিক্রম। কি ব্যাপার কে জানে? ব্যাপার আর কিছুই নয়। ঠাকুরের বটুয়ার মশলা ফুরিয়ে গেছে। তাই তিনি আজ স্বয়ং এসেছেন মশলা চেয়ে নিতে। একি অন্নপূর্ণার কাছে মহাদেবের ভিক্ষে চাওয়া না অন্য কিছু? ঠাকুরকে কাছে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন সারদামণি। কিছু যোয়ান আর মৌরি খেতে দিলেন ঠাকুরকে। আবার তো তাঁর রাত্রে দরকার হবে। তখন ঠাকুর মৌরি পাবেন কোথায়? তাই সারদামণি যত্ন করে দুটি মশলা কাগজে মুড়ে ঠাকুরের হাতে দিয়ে দিলেন, বললেন, 'পরে খেও।'

মশলার পুঁটলি নিয়ে ঠাকুর চলেছেন নিজের ঘরের দিকে। কিন্তু হঠাৎ যেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ঘরের দিকে আর যেতে পারলেন না। সোজা চলে গেলেন গঙ্গার দিকে। 'মা ডুবি, মা ডুবি' —বলতে বলতে গঙ্গার জলে নেমে পড়ার জোগাড় আর কি!

সারদামণি দূর থেকে সব লক্ষ্য করলেন। ঠাকুরের এই অবস্থা দেখে তিনি একেবারে শিউরে উঠলেন। সর্বনাশ! এখন তিনি কাকে ডাকেন! কি করেন! ভাগ্যিস, সে সময়ে মন্দিরের একটি বামুন সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সারদামণি চীৎকার করে তাকে ডাকলেন, বললেন, 'শিগগির হৃদয়কে ডেকে নিয়ে আসুন।'

হৃদয় তখন খেতে বসেছিল। ব্যাপার গুরুতর বুঝে ও এঁটো হাতেই উঠে এল। জলে নেমে ঠাকুরকে জোর করে জল থেকে তুলে নিল।

ঠাকুর ভাবতে লাগলেন, কেন এমন হল? উত্তরও তিনি সাথে সাথে খুঁজে পেলেন। তিনি খানিকটা সঞ্চয় করে ফেলেছিলেন। তাই তাঁর এ দশা হয়েছিল।

ঠাকুর আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। মশলার পুঁটলি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জলে।

একদিন একটি তেরো-চোদ্দ বছরের বালক লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পুজোর নৈবেদ্যের দিকে। তখনো পুজো আরম্ভ হয়নি। কেবলমাত্র নৈবেদ্যের থালা সাজানো হয়েছে। এর মধ্যেই লোভ! কোন সংযম নেই, ধৈর্য নেই, ছেলেগুলো কি? সেই নৈবেদ্য আর দেওয়া হল না পুজোয়।

আবার কিছুদিন পরে নৈবেদ্যের প্রতি ঠিক একই প্রকার লুব্ধ দৃষ্টি। শ্রীমা সেবার আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। নৈবেদ্য থেকে খাবার তুলে এনে ছেলেটাকে খাওয়াতে লাগলেন। আশে-পাশের লোকজন দেখে তো একেবারে অবাক! একি অনাসৃষ্টি! নৈবেদ্য এখনও দেবতাকে নিবেদন করা হয়নি, আর তা থেকে খাবার তুলে কিনা ছেলেটাকে খাওয়ানো হচ্ছে! কেউ কেউ সাহস করে মাকে দু'কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়ল না। শ্রীমা বললেন, 'জান না, ওর ভেতরেও যে ঈশ্বর আছেন।' এই কথা বলেই তিনি সেই নৈবেদ্যের থালা ধরে দিলেন পুজোয়। সবাই তখন চুপ।

সেদিন নহবতের কাছে এসে এক ভিখিরী ভিক্ষা চাইল। ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ নীচে ছিল। 'যা এখন বিরক্ত করিসনে'—বলে ওদের একজন ভিখিরীকে তাড়িয়ে দিল।

তারা দেখতে পায় নি মা তাদের এই ব্যাপারটা দেখে ফেলেছেন।

তিনি উপরে ছিলেন। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে খুবই চঞ্চল ও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে ভক্তদের খুব করে বকে দিলেন। এটা তাঁর কাছে একটা অপরাধের মতোই মনে হয়েছিল। একজন প্রার্থী ফিরে যাবে শুধু হাতে তাঁর দরজা থেকে। বললেন, 'দিলে তোমরা ভিখিরীটাকে তাড়িয়ে? একটু উঠে এসে ভিক্ষে দিতে হবে—এতটুকু কষ্টও তোমরা কেউ করতে পারলে না? বড় লজ্জার ব্যাপার! বেশি তো নয়—এক মুঠো ভিক্ষে ওর প্রাপ্য—তা থেকেও তোমরা ওকে বঞ্চিত করলে! যার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতে হয়। এই ধর, তরকারির খোলা—ওগুলো গরুর খাদ্য। এগুলোও গরুর মুখের সামনে ধরতে হয়।' শ্রীমার মানুষের প্রতি, এমন কি জীবের প্রতি এই দয়া দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেল।

সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরের কোমলতায় ভক্তরা বুঝতে পারল ইনি সত্যিই সকলের মা হবার জন্যই এ জগতে অবতীর্ণা হয়েছেন। এত দয়া, এত স্নেহ, এত কোমলতা সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্ভব নয়।

॥ চৌদ্দ ॥

বাংলা ১২৯২ সালের বৈশাখ মাস। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গলায় ক্ষত। খেতে কষ্ট হয়। কথা বলতে অসুবিধে। তবুও তার বিশ্রাম নেই। একই ভাবে ভক্তদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন। আলোচনা করছেন। একদিন হঠাৎ গলগল করে গলা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। সবাই খুব ভয় পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

এরপর ভক্তরা স্থির করলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবেন। ঠাকুর রাজী হলেন কলকাতায় যেতে।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়িতে ঠাকুর গিয়ে উঠলেন। সারদামণি কিন্তু দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন। মুখ ফুটে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। একাকী বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অনুপস্থিত। তাঁকে কেন্দ্র করেই তো দক্ষিণেশ্বরে অগণিত ভক্তের সমাগম। যেন একেবারে ভক্তির হাট বসেছে। ঠাকুর কলকাতায়—তাই এখন সেই হাটে নেই কারো আনাগোনা। এক বেদনার সুর যেন সারা দক্ষিণেশ্বরেব আকাশে বাতাসে মর্মরিত হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণহীন এক শূন্যতা।

শ্যামপুকুরে যথারীতি ঠাকুরের চিকিৎসা চলতে লাগল। প্রথমে কবিরাজী দিয়ে শুরু হল—কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া গেল না। সবাই তখন এলোপ্যাথি চিকিৎসার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু ঠাকুর এলোপ্যাথি চিকিৎসা পছন্দ করেন না। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র সরকারকে ডাকা হল—নাম করা হোমিওপ্যাথ। এক ফোঁটা

ওষুধেই নাকি উনি অসাধ্যসাধন করতে পারেন।

কিন্তু ওষুধই সব নয়। তার সঙ্গে চাই যোগ্য সেবা আর যত্ন। ভক্তরা প্রাণ দিতে পারেন--কিন্তু সেবা যত্নের জন্যে যে নিপুণতা থাকা প্রয়োজন, যে মমতা—তা আছে ক'জনার? ঠাকুরের জন্য পথ্যই বা রেঁধে দেবেন কে?

তাই ভক্তরা এবার ঠিক করলেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীমাকে নিয়ে আসবেন। ঠাকুরের কাছে তাঁরা সে প্রস্তাব রাখলেন। ঠাকুর মনে মনে খুব খুশি হলেন সে প্রস্তাবে। কিন্তু তিনি মুখে বললেন, 'ও এসে থাকবে কোথায়? তোমরা ওঁকে গিয়ে সব খুলে বলো। উঁনি যদি আসতে চান—তবে আসুন।'

মায়ের কাছে খবর গেল। এই মুহূর্তটির জন্যই কি শ্রীমা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন! ছুটে এলেন তিনি। শ্যামপুকুরে ঘরদোরের ভাল ব্যবস্থা নেই—তাতে কি এসে যায়? মায়ের নীতি হল, 'যখন যেমন, তখন তেমন—যেখানে যেমন সেখানে-তেমন।'

দোতলায় ঠাকুরের ঘর। পশ্চিম কোণের দিকে একটা ঘরে মার জন্য ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সারাদিন শ্রীমাকে কাটাতে হয় তেতলায় ছাদের পাশে ছোট্ট একটা চাতালে।

মা রোজ তিনটের সময় উঠে স্নানে যান। সারা বাড়িতে একটি মাত্র কল-চৌবাচ্চা। তাই রাত থাকতে উঠে স্নানাদি সেরে না ফেললে মহা অসুবিধা। স্নান সেরে শ্রীমা চলে যান সেই চাতালে। সেখানে বসে বসে ঠাকুরের জন্য পথ্যাদি তৈরি করেন। কিন্তু সব সময় মনটি পড়ে থাকে ঠাকুরের দিকে। কি করে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন—দিনরাত কেবল সেই চিন্তা। ঠাকুরকে নিজের হাতে খাওয়াবেন—এও শ্রীমায়ের একান্ত সাধ। কিন্তু লোকজনের আনা-গোনার জন্য অনেক সময়েই হয়ে ওঠে না। ঠাকুরতো আর শ্রীমায়ের একার নন—তিনি যে সবার!

দিনের পর দিন সর্বংসহা হয়ে শ্রীমা অশেষ ক্লেশ ভোগ করেছেন—তবু তিনি হাল ছাড়ছেন না কিংবা একেবারে ভেঙেও পড়ছেন না। আশায় আশায় কেবল বুক বাঁধছেন—ঠাকুর নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু লক্ষণ কোথায়? অসুখ সারছে কই? বরং দিনের পর দিন তা বেড়েই চলেছে।

ব্যাপারটা নিয়ে ভক্তরাও চিন্তিত। তাইতো ঠাকুর নীরোগ হয়ে উঠছেন না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চিন্তা করলেন—ঠাকুরকে কোথাও একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার—যেখানে প্রচুর আলো বাতাস। খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত কাশীপুরে একটা খোলা-মেলা বাড়ি পাওয়া গেল। কিন্তু ভাড়াটা একটু বেশি। কে দেবে এত টাকা ভাড়া? সঙ্গে সঙ্গে জুটে গেল টাকার জোগানদার। সুরেশ মিত্তির নামে এক ভক্ত এগিয়ে এসে বললেন, 'আমিই দেব ভাড়ার টাকা।'

অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে ঠাকুর শ্যামপুকুর ছেড়ে চলে এলেন কাশীপুরের সেই বাগানবাড়িতে। ভারী সুন্দর বাড়িটি। চারদিকে ফুল আর ফুল। বাতাসে তার সৌগন্ধ। দোতালা বাড়ি। উপরের একটা হল ঘরে ঠাকুরের থাকার ব্যবস্থা। দক্ষিণ দিকে ছোট একটুখানি ঘেরা ছাদ। ঠাকুর সকাল-বিকাল সেখানে একটু হাঁটা-চলা করেন। শ্রীমায়ের থাকার ঘর নীচে পুবের দিকে। মাকে এবার সঙ্গ দেবার জন্য আনা হয়েছে লক্ষ্মীকে। এখানে মা নিয়মিত পথ্যাদি তৈরি করেন আর ঠাকুরকে নিজ হাতে খাইয়ে আসেন। অহরহ ঈশ্বরের কাছে সকরুণ প্রার্থনা করেন—ঠাকুরকে বাঁচিয়ে দাও।

যাঁরা লাভের আশায় ঠাকুরের সান্নিধ্য চেয়েছিলেন—তাঁরা একে একে বিদায় নিলেন। যাবার আগে আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন—উনি তো পরমহংস! অবতার! ওঁনার আবার অসুখ বিসুখ কেন? কিন্তু নরেন, রাখাল, লাটু, নিরঞ্জন প্রমুখ ভক্তগণ অহোরাত্র

ঠাকুরের সেবা করে যাচ্ছেন।

একদিন সন্ধ্যের সময়ে নরেনরা বাগানের খেজুর গাছ থেকে রস চুরি করে খাবেন স্থির করলেন। ঠাকুর তখন এত দুর্বল হয়ে পরেছেন যে দিন-রাত শুয়ে শুয়েই কাটান। হাঁটা-চলা একদম করতে পারেন না। হঠাৎ শ্রীমা দেখতে পেলেন, ঠাকুর তাঁর ঘর থেকে তীর বেগে নীচের দিকে নেমে গেলেন।

বিছানায় যাঁকে এপাশ ওপাশ করিয়ে দিতে হয়, তিনি এত দ্রুতবেগে নেমে গেলেন কি করে? একি চোখের ভ্রম না অন্য কিছু? মনের সংশয় নিরসনের জন্য শ্রীমাও দ্রুত চলে এলেন উপরে ঠাকুরের ঘরে—কিন্তু কি সর্বনাশ! ঠাকুর সেখানে নেই—ঘর ফাঁকা। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও ঠাকুরকে দেখতে পেলেন না সারদামণি। হতভম্বের মত শ্রীমা চলে এলেন নিজের ঘরে। এখন কি করবেন, ভাবছেন। ঠিক এমন সময় আবার হঠাৎ দেখতে পেলেন, ঠাকুর যেমনি দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন। নিজের ঘরটিতে পৌঁছে আবার তিনি রোগশয্যায় শুয়ে পড়লেন। শ্রীমা ঘটনাটা দেখলেও তখন কিছু বললেন না।

পরের দিন সকালে পথ্য খাওয়াতে খাওয়াতে কথাটা পাড়লেন তিনি।

ঠাকুর প্রথমে কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু শ্রীমাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। কারণ তিনি নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছেন।

'তুমি দেখে ফেলেছ নাকি?' বাধ্য হয়ে ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'তাহলে তো তোমাকে আর এড়াবার জো নেই। বেশ তবে খুলেই বলি ঘটনাটা—ভূমিকা করে ঠাকুর ঘটনাটা বিবৃত করলেন, 'ছেলেরা সন্ধ্যের সময়ে দল বেঁধে খেজুরের রস খেতে যাচ্ছিল। আমি স্পষ্ট

দেখতে পেলুন, খেজুর গাছের তলায় রয়েছে একটা ভয়ানক বিষধর সাপ। ছেলেদের যে-কোন মুহূর্তে কামড়ে দিতে পারে—কামড়ে দিলে আর রক্ষে নেই। তাই গাছতলায় ছেলেদের পৌঁছানর আগেই আমি চলে গেলাম সেখানে অন্য পথ দিয়ে। সাপটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম।'

একদিন বিকেলবেলা নাট্যাচার্য গিরীশ ঘোষ এবং আরও কয়েকজন ভক্ত এসে বসেছেন বাগানে। ঠাকুরের অসুখ আরও বেড়ে গেছে। তাই তাঁর ঘরে লোকজনের আনাগোনা একেবারে বন্ধ। তবু অগণিত ভক্তবৃন্দ আসেন ঠাকুরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। দর্শন না পেলেও তাঁদের দুঃখ নেই। ঠাকুরের খবরাখবর নিয়ে তাঁরা চলে যান। তাই সেদিন অনেক ভক্তই বসেছিলেন বাগানে।

কথা নেই বার্তা নেই—ঠাকুর সবাইকে অবাক করে দিয়ে নেমে এলেন বাগানে একাই। ভক্তদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আজ আমি কল্পতরু হয়েছি!' এক এক করে ভক্তদের স্পর্শ করে তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপর তাদের বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'চৈতন্য হোক।' ভক্তদের লুপ্ত আধ্যাত্মিক চেতনাকে এমনি করে জাগিয়ে দিলেন ঠাকুর।

কিন্তু ঠাকুরের রোগ বেড়েই চলল। গলার ভেতরের ঘা বাইরেও দেখা দিল। শ্রীমা আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। মাঝে মাঝে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েন। আবার নিজেকে সংহত করে ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীমা আপন মনে ঠিক করলেন—তিনি তারকেশ্বরে যাবেন। সেখানকার মন্দিরে গিয়ে তিনি হত্যে দেবেন, যদি বাবা তারকনাথের দয়া হয়! ঠাকুরের রোগ নির্মূল হয়ে যায়।

সংকল্প মতো সত্যিই তিনি ছুটে এলেন কাশীপুর থেকে তারকেশ্বরে। বাবা তারকনাথের মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়ে রইলেন।

গভীর রাত্রে একটা শব্দ শুনে শ্রীমা চমকে উঠলেন। চেয়ে দেখলেন, এক জ্যোতির্ময় ছায়ামূর্তি ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। সেই ছায়ামূর্তি থেকে অপূর্ব এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল। দৈববাণীর মত শোনা গেল, 'মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে একদিন না একদিন তাঁর মৃত্যু হবেই। কাজেই এতে অধীর হবার কিছু নেই। যা জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি, তাকে মেনে নিতে হবেই।'

শ্রীমাও যেন অনেকটা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারলেন। মৃত্যু জীবনের অমোঘ পরিণতি। মায়া দিয়ে তাকে আটকান যায় না। একটা উপলব্ধির শান্ততা মার মনে স্থিরনিশ্চয় হল। ফিরে এলেন তিনি তারকেশ্বর থেকে অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা নিয়ে। ঠাকুর শ্রীমাকে দেখেই বুঝে ফেললেন কি অনুভব নিয়ে শ্রীমা তারকেশ্বর থেকে ফিরেছেন। তাই হাসতে হাসতে শ্রীমাকে বললেন, 'কিগো, কিছু সুবিধা করতে পারলে ?'

মা চুপ করে রইলেন। ঠাকুর বোঝালেন, 'সবই মায়া। দেহের জন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই। সবাইকেই তো একদিন দেহ ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

তবুও কি সারদামণির মন শান্ত হয় ? তিনি নিরম্বু উপবাস করে কাটিয়ে দিলেন দুদিন। এই দুদিন তিনি ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। যদিও অন্তর থেকে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পেলেন না।

আবার ছুটে গেলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে। মনে বাসনা গঙ্গায় স্নান সেরে মা কালীকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানাবেন সারদামণি। কিন্তু স্নান সেরে প্রার্থনা জানাতে গিয়ে মা কালীর দিকে তাকিয়ে শ্রীমা একেবারে চমকে উঠলেন। একি ! মা কালীর গলাতেও যে দগদগে ঘা !

আবার ফিরে এলেন তিনি কাশীপুরের বাগানবাড়িতে। কান্নায়

একেবারে ভেঙে পড়লেন সেখানে সাধারণ এক মানবীর মতো।

শ্রীমা পলতে দিয়ে ঠাকুরের গলার ঘা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। ঠাকুর সহিষ্ণুতার সঙ্গে সেই সেবা গ্রহণ করছেন। একদিন তিনি শ্রীমাকে বলছেন, 'জান, আমার এই দেহের মধ্যে মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। প্রথম যখন আমার এই অবস্থা হয়, তখন দেহ জ্যোতিতে জ্বলজ্বল করত। তখন আমি মাকে কাতর কণ্ঠে বলতুম, মা বাইরে প্রকাশিত হয়ো না, ভেতরে ঢুকে যাও। সেই জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে আমার কি অবস্থা হত জান? লোক-জন এসে আমাকে ভয়ানক জ্বালাতন করত। দিন-রাত চব্বিশঘণ্টা লোক-জনের ভিড় লেগেই থাকত। এখন বাইরে প্রকাশ নেই বলে আগাছা সব পালিয়ে গেছে।'

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার। সেদিন মা খিচুড়ি রাঁধ-ছিলেন। বেশ অন্যমনস্ক ছিলেন তিনি। হয়তো ঠাকুরের কথাই ভাবছিলেন বসে বসে। খিচুড়ি ধরে গেল। ছেলেদের সেই পোড়া খিচুড়িই খাওয়ানো হল। ছাদে মার একটা ভাল শাড়ী শুকোচ্ছিল —তাও সেদিন চুরি হয়ে গেল। মা'র বুঝতে বাকি রইল না যে, কোন অশুভ ঘটনার পদক্ষেপ দেখা দিচ্ছে তাঁকে ঘিরে।

সেদিন রাত প্রায় একটার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইষ্টনাম জপ করতে করতে সমাধিমগ্ন হলেন। সেই সমাধিই মহাসমাধিতে পরিণত হল। মুখে তখনও অপূর্ব মৃদু হাসি। ভক্ত শিষ্যরা সবাই সমাধিস্থ দেহ ঘিরে নামসংকীর্তন করতে লাগল। শ্রীমা ভোরবেলা ঘরে ঢুকে সব বুঝতে পেরে, 'আমার কালী কোথায় গেল গো' বলে চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

শ্রীমা মাতৃহারা শিশুর ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন।

ঠাকুরের লীলা সংবরণের পর, শ্রীমায়েরও এইরূপ অভিলাষ হতে পারে ভেবে ঠাকুর শ্রীমাকে একদিন বলেছিলেন, 'আমার দেহত্যাগ

হলে পর, তুমিও তাড়াতাড়ি দেহ ছেড়ে চলে যেতে চেও না। ঈশ্বরকে ভুলে অন্যায় কাজ করে লোকগুলো পোকার মত কিবকিল করছে—দুঃখ ভোগ করছে। কেমন করে ঈশ্বরের ভজনা করতে হয় তুমি তা তাদের শেখাবে—শক্তি দেবে—ভক্তি দেবে—আমি যা কাজ করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ তোমাকে করতে হবে।'

ঠাকুর জানতেন স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে শ্রীমাই ধরে রাখতে পারবেন তাঁর মানস সন্তানদের যারা তখনও পরিণত হয় নি পরিপূর্ণভাবে। তাই আগে ভাগেই এই কথা তিনি বলে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিণী এই মা ইচ্ছে করলেই নিমেষে তাঁর লীলাকে গুটিয়ে নিতে পারেন।

শ্রীমা নিজেও ঠাকুরের উপদেশ ভুলে যান নি। সযত্নে তিনি ঠাকুরের লীলা সংবরণের পরে নিজের হৃদয়ে তুলে নিলেন সেই আরব্ধ কাজ।

॥ পনেরো ॥

শ্রীমায়ের জীবনের পট পরিবর্তন হয়েছে। এবার তাঁকে সিঁথির সিঁদুর মুছতে হবে বৈধব্যের অমোঘ নিয়মে। রক্তিম পোশাক পরিত্যাগ করে পরতে হবে শুভ্র পোশাক। গায়ের অলঙ্কারাদি খুলে শ্রীমা যখন হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, তখন কোত্থেকে ঠাকুর এসে শ্রীমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'হাতের বালা খুলতে যাচ্ছ কেন? আমি কি কোথাও গেছি? এই যেমন এঘর থেকে সে ঘর।'

ঠাকুর মাকে দু'টি কথায় বুঝিয়ে দিলেন জীবন-মৃত্যুর রহস্য। ইহকাল আর পরকালের কথা।

এরপর থেকে শ্রীমা চিরসীমন্তিনী হয়ে রইলেন। শাড়ির চওড়া পাড় ছিঁড়ে সরু করে পরলেন। পরে সরু লালপেড়ে কাপড় পরতেন। গলায় হার, হাতে বালা ও ঠাকুরের স্বর্ণকবচটি ধারণ করে রইলেন শ্রীমা। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মায়ের নিরাভরণা হয়ে থাকতে নেই।

সপ্তাহখানেক পর কাশীপুরের বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। শ্রীমা ঠাকুরের পূত অস্থি কৌটোয় পুরে নিয়ে এলেন ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে। জন্মাষ্টমীর দিন ভক্ত রামবাবুর কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে সেই পূত অস্থির কিয়দংশ সমাধিস্থ করা হল।

কলকাতায় শ্রীমায়ের মন আর টিঁকছিল না। তিনি কেবল চুপচাপ বসে থাকতেন। বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করে এলে হয়তো শ্রীমায়ের মন একটু হালকা হতে পারে, এই আশায় কয়েকজন ভক্ত শ্রীমাকে নিয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সঙ্গে গেলেন গোলাপমা, লক্ষ্মীদিদি এবং আরও কয়েকজন ভক্ত। পথে শ্রীমা

দেওঘর, কাশী এবং অযোধ্যা পরিদর্শন করলেন।

কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি দেখে শ্রীমা ভাবে বিভোর হয়ে পড়লেন। তিনদিন ধরে কাশীর বিভিন্ন দেব-দেউলে ঘুরে বেড়ালেন শ্রীমা। কাশী থেকে শ্রীমা গেলেন অযোধ্যায়। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যা পরিদর্শন করে শ্রীমা খুবই আনন্দিত হলেন।

অযোধ্যা থেকে শ্রীমা রওনা হলেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। শ্রীমার হাতে রয়েছে ঠাকুরের দেওয়া ইষ্টকবচ। সেই কবচের নিত্য পুজো করেন শ্রীমা। তিনি রেলের কামরায় শুয়ে আছেন, কবচশুদ্ধ হাত রয়েছে জানালার বাইরে। সেই সোনার কবচ দেখে লুব্ধ হল একটা দুষ্ট লোক। শ্রীমার খেয়াল নেই। কিন্তু মার সঙ্গে রয়েছেন যে ঠাকুর। তিনি অপ্রত্যক্ষ থেকে সব প্রত্যক্ষ করছেন। তাই সটান হাজির হলেন মার সামনে। বললেন, 'অমন করে বাইরে হাত রেখ না। চোরে চুরি করে ইষ্টকবচ নিয়ে যাবে।' অমনি মা হাত গুটিয়ে নিলেন। হাত থেকে তাড়াতাড়ি কবচ খুলে তা রেখে দিলেন একটি বাক্সে। সেই বাক্সেই থাকে তাঁর নিত্যপূজার সামগ্রী ও ঠাকুরের ছবি।

বৃন্দাবনে আবার হাতের বালা খুলতে গেলেন শ্রীমা। আবার ঠাকুর এসে দেখা দিয়ে বললেন, 'তুমি হাতের বালা খুলো না। আজ বিকেলে গৌরমণি এসে তোমাকে বৈষ্ণবতন্ত্র সম্বন্ধে বলবেন।'

বিকেলে সত্যি সত্যি গৌরীমা এসে হাজির। তিনি সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, কৃষ্ণ পতি যাঁর, তিনি চির সধবা। এই প্রসঙ্গে তিনি চিন্ময় স্বামীর গল্পটি বলেন। 'এক সতী সাধ্বী স্ত্রী স্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কাচের চুড়ি পরেছেন। স্বামী মারা যাবার পর তিনি কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলে দিয়ে সোনার বালা হাতে পরলেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, 'এতদিন আমার স্বামীর দেহ কাঁচের চুড়ির মত ক্ষণ-ভঙ্গুর ছিল। এখন তিনি নিত্য

অখণ্ডস্বরূপ। তাই আমি কাঁচের চুড়ি ফেলে দিয়ে সোনার বালা পরেছি।'

শ্রীমা বৃন্দাবনে আছেন। বালিকার ন্যায় তিনি এক মন্দির থেকে আরেক মন্দির দর্শন করে বেড়াতে লাগলেন। একদিন রাত্রিবেলা বাঁশির আওয়াজ শুনে তিনি শ্রীরাধিকার ভাবে আকুল হয়ে যমুনা নদীর দিকে ছুটতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে ভাবের আবেশে তিনি পড়ে গেলেন।

মাঝে মাঝে শ্রীমা গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। তাঁর কানে জোরে জোরে বারবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে তবে তাঁর ধ্যান ভাঙত।

দোলপূর্ণিমার দিন কয়েকটি ছেলে শ্রীমাকে আবীর দিতে চাইল। শ্রীমা সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। ওরা মায়ের পায়ে আবীর দিয়ে মাকে প্রণাম করল। শ্রীমাও ছেলে-মানুষের মত ওদের আবীর থেকে খানিকটা আবীর নিয়ে ওদের মুখ-গাল রাঙিয়ে দিলেন।

বৃন্দাবনে আবার একদিন ঠাকুর দেখা দিয়ে শ্রীমাকে বললেন যোগীন্দ্রকে দীক্ষা দেবার জন্য। মা ভাবলেন, হয়তো তিনি ভুল দেখেছেন। তাই দ্বিধাবশতঃ তিনি ঠাকুরের আদেশ পালন করেন নি। কিন্তু ঠাকুর বারবার দেখা দিয়ে একই আদেশ করতে লাগলেন। এদিকে ঠাকুরও একদিন যোগীন্দ্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে শ্রীমার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে বললেন।

টিনের বাক্সটি সামনে রেখে শ্রীমা পুজো করছেন। টিনের বাক্সটিতে আছে ঠাকুরের একখানা ফটো, আর আছে ঠাকুরের দেহাবশিষ্ট। যোগেন পাশে বসে রইলেন। নীরবে পুজো করতে করতে হঠাৎ শ্রীমা জোরে জোরে বীজমন্ত্র বলে ফেললেন। তাই হল যোগেনের মন্ত্র।

একদিন শ্রীমা এসেছেন রাধারমণের মন্দির দর্শনে। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমা করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু! আমি

যেন কারো দোষ দেখতে না পাই। সকলের ভালর মধ্যেই যেন আমি তোমার আলো দেখতে পাই।'

বৃন্দাবনে বংশীবটে কালীবাবুর বাড়িতে আরেকদিন সমাধি হল মা'র। অনেকক্ষণ ধরে সমাধিতে রয়েছেন দেখে যোগেন-মা কানে কানে কত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কিছুতেই সমাধি ভাঙল না। তখন ডাক পড়ল যোগানন্দের। তিনি এসে কানে কানে নাম করতেই শ্রীমা অর্ধবাহ্যদশায় নেমে এসে বললেন, 'খাব।' ঠাকুরও এরকম সমাধি থেকে মেমে এসে জল খাওয়ার কথা বলতেন। মায়ের সামনে রেকাবীতে করে কিছু মিষ্টি, জল আর পান রাখা হল। ঠিক ঠাকুরের মত খুঁটে খুঁটে নিলেন সব।

যোগানন্দ শ্রীমাকে সমাধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই শ্রীমা উত্তর দিতে লাগলেন; যেন একেবারে ঠাকুরের গলা এবং ভঙ্গি। শ্রীমা বললেন, দেখলুম, ঠাকুরই সব হয়ে রয়েছেন। যেদিকে তাকাই— সেদিকেই ঠাকুর। কানা, খোঁড়া, চাষা, মুটে—সবাই ঠাকুর ছাড়া কেউ নন। বুঝতে পারলুম, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব যেন কোন কষ্ট পাচ্ছে না, তিনিই কষ্ট পাচ্ছেন। যদি কেউ এসে কেঁদে কেটে পড়ে, মনে হয় এ যেন তাঁরই কান্না।'

প্রায় বছর খানেক শ্রীমা ছিলেন বৃন্দাবনে। সেখান থেকে গেলেন হরিদ্বারে। সেখানে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে ঠাকুরের নখ আর কেশ ফেললেন। তারপর জয়পুরে। জয়পুর থেকে পুষ্কর। ফেরার পথে এলেন প্রয়াগে। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে ফেললেন ঠাকুরের অবশিষ্ট কেশ আর নখ। উত্তাল তরঙ্গ এসে মায়ের হাত থেকে কেড়ে নিল সেই কেশ।

এমনি করে বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করে শ্রীমা ফিরে এলেন কলকাতায়।

॥ ষোল ॥

কলকাতায় ফিরে এসে শ্রীমা উঠলেন বলরাম বসুর বাড়িতে। ঠাকুরের একজন পরমভক্ত বলরাম। সেই বাড়িতে শ্রীমা কাটালেন প্রায় পনেরো দিন। যে কয়েকদিন শ্রীমা সে বাড়িতে ছিলেন, বাড়িখানা যেন এক মহাতীর্থে পরিণত হয়েছিল।

এরপর গোলাপ-মা ও যোগানন্দকে সাথে নিয়ে শ্রীমা কামারপুকুর যাত্রা করলেন। বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে গেলেন। বর্ধমান ছেড়ে রওনা হলেন পায়ে হেঁটে। যেতে হবে ষোল মাইল পথ।

পথের পাশে এক গাছতলায় গোলাপ-মা খিচুড়ি রাঁধলেন। গোলাপ মায়ের হাতে রাঁধা খিচুড়ি খেয়ে মায়ের কি আনন্দ! বললেন তিনি, 'গোলাপ, তুমি যা খিচুড়ি রেঁধেছ, এ যেন অমৃত।'

মাটির স্বর্গধাম কামারপুকুর দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। ঠাকুরের জন্মস্থান এই কামারপুকুর। শ্রীমা দূর থেকেই হাত জোড় করে কামারপুকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

তিন দিন পর যোগানন্দ চলে গেলেন তীর্থভ্রমণে। গোলাপ-মাও চলে গেলেন ক'দিন পর। শ্রীমা একা আছেন কামারপুকুরে।

সারা গাঁয়ের লোক কানাঘুষা শুরু করে দিল। বিধবার পরনে কিনা পাড়ওয়ালা কাপড় আর হাতে বালা। এরকম অনাসৃষ্টি ব্যাপার কে দেখেছে? সারা গাঁয়ে বিরূপ আলোচনা চলতে লাগল।

সমস্ত বিরুদ্ধ বাতাসকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এলেন লাহাদের বোন প্রসন্নময়ী। তিনি সবাইকে একেবারে ঝাঁঝিয়ে বলে দিলেন, 'জান তোমরা এঁকে? এঁ গদাইএর বৌ।

এঁ তোমাদের মত সাধারণ মেয়ে নয়। এঁ অসামান্যা—সাক্ষাৎ ভগবতী।'

তবুও একদিন শ্রীমা হাতের বালা খুলতে গিয়েছিলেন। ঠাকুর আবার দেখা দিয়ে হাতের বালা খুলতে নিষেধ করলেন।

ঠাকুর দেহরক্ষার পূর্বে একদিন শ্রীমাকে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি কিছুদিন কামারপুকুরে গিয়ে থাকবে। শাক-ভাত যা জোটে তাই খেয়ে সুখে থাকবে—আর দিনরাত হরিনাম করবে।'

কামারপুকুরে এসে দীনতম দরিদ্রের মত জীবন-যাপন করতে লাগলেন শ্রীমা। যিনি জগজ্জননী, তাঁর এক কণা নুন পর্যন্ত জোটে না।

বাড়ির সামনে রয়েছে খানিকটা জমি। শ্রীমা নিজহাতে কোদাল দিয়ে জমিটুকু কোপালেন। তাতে শাক-সব্‌জি ফলালেন। ঢেঁকিতে নিজের হাতে চাল কোটেন। ভাত রেঁধে প্রথমে ঠাকুরকে নিবেদন করে তারপর তিনি খেতে বসেন। একান্তভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে লাগলেন। অথচ তাঁর ঘোরতর দারিদ্র্যের কথা কাউকেই জানতে দিলেন না। তাঁর মা আছেন জয়রামবাটিতে—তাঁকে পর্যন্ত কিছুই জানালেন না।

একদিন মা শ্যামাসুন্দরী খবর পাঠালেন—জয়রামবাটি যাবার জন্য। সারদামণি খবর পেয়ে চলে এলেন জয়রামবাটিতে। কিন্তু এতদিন পর হঠাৎ মেয়ের চেহারা দেখে শ্যামাসুন্দরী একেবারে আঁৎকে উঠলেন। দেখলেন সারদামণির একেবারে ভিখারিণী মূর্তি। পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি। মাথায় জট পাকানো রুক্ষ্ম চুল। শ্যামাসুন্দরী সারদামণিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সারদামণি কিন্তু বিন্দুমাত্র চোখের জল ফেললেন না। চরম দারিদ্র্যক্লিষ্টতার মধ্যেও যে জগজ্জননীর প্রসন্নতা রয়েছে, কে লক্ষ্য করেছে সেইরূপ?

শ্যামাসুন্দরী সারদামণিকে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন কিছুদিন

জয়রামবাটিতে থেকে যাবার জন্যে। মেয়েকে একটু আদর-যত্ন করে খাইয়ে পরিয়ে তাঁকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু সারদামণি কিছুতেই রাজী হলেন না বেশি দিন জয়রামবাটিতে থাকতে।

ফিরে গেলেন তিনি আবার কামারপুকুরে। ঠাকুর যেভাবে তাঁকে রাখেন সেভাবেই তিনি থাকবেন। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, 'আমাকে যে স্মরণ করে, তার কখনো খাওয়া-পরার কষ্ট হয় না।'

শ্রীমায়ের এক ভাই প্রসন্নকুমার কলকাতায় ছিলেন। তিনি জানতে পারলেন দিদির কষ্টের কথা। তিনি আবার রামলালকে খবর দিলেন। রামলাল খবর পেয়ে তো চটেই আগুন। 'ভাই হয়ে তোমরা বোনের দুর্দশা দূর করার কোন চেষ্টাই করলে না?' শাসিয়ে বলল রামলাল প্রসন্নকুমারকে।

ক্রমে ক্রমে খবর গিয়ে পৌঁছালো গোলাপ-মার কাছে। মায়ের দুর্দশার খবর পেয়ে গোপাল-মা অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি চেপে ধরলেন ঠাকুরের সব গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের। এঁরা যাঁর ধ্যান করছেন—তিনিই আজ রয়েছেন অর্ধাশনে।

এতে মন্ত্রের মত কাজ হল। সবাই মিলে চাঁদা সংগ্রহ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। ভক্তরা শ্রীমাকে চিঠি দিলেন কলকাতায় চলে আসার জন্য।

কামারপুকুরে আবার শুরু হল গুঞ্জন। অল্প বয়সের বিধবা। তিনি কি করে থাকবেন কলকাতায় সব অনাত্মীয় ভক্তদের সঙ্গে?

আরো নতুন ধরনের জল্পনা-কল্পনা, আলোচনা সমালোচনার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন সেই লাহাদের বাড়ির মেয়ে প্রসন্নময়ী। তিনি অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করে সারদামণিকে বললেন, 'তুমি যাবে বৈকি!'

প্রসন্নময়ীর মুখের ওপর কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করল না।'

সারদামণি চলে এলেন কলকাতায়।

একবার বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জির বাড়িতে আছেন শ্রীমা। সে

সময়ে এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী প্রায়ই শ্রীমাকে দেখা দিয়ে বলেন, 'পঞ্চতপা কর—আনন্দ পাবে।' পঞ্চতপা কি জিনিস শ্রীমা জানেন না। তাই তিনি এ ব্যাপারে প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসী বারবার শ্রীমাকে দেখা দিয়ে একই কথা বলেন, 'পঞ্চতপা কর, পঞ্চতপা কর।'

শ্রীমা পঞ্চতপা নিয়ে চিন্তিত হলেন। একদিন তিনি যোগেন-মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, পঞ্চতপা কাকে বলে তুমি কিছু জান?' যোগেন-মা খবর নিয়ে এলেন। পঞ্চতপা হল অগ্নির তপস্যা। চার-দিকে চারটি মস্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে মাঝখানে বসতে হয়। আর মাথার উপর থাকে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ। এমনি করে অগ্নি কুণ্ডলীর মাঝখানে বসে ধ্যান আর প্রার্থনা করার নামই হচ্ছে পঞ্চতপা।

যথারীতি পঞ্চতপার আয়োজন করা হল। চারদিকে অগ্নিকুণ্ডলী জ্বলে উঠল নির্দিষ্ট দিনে। ভোর বেলা স্নান সেরে সূর্য ওঠার পর শ্রীমা বসলেন সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডলীর মাঝখানে। এই অগ্নি-কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে আসবেন তিনি সূর্য অস্ত গেলে। পারবেন কি এই সকলকে আগুনের মধ্যে বসে শ্রীমা তপস্যা করতে? ঠাকুর যেখানে সহায় রয়েছেন, কোন অসাধ্য সাধনই আজ তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

এক দু'দিন নয়—সাত দিন শ্রীমা করলেন পঞ্চতপার অনুষ্ঠান। আগুনের তেজে তাঁর শরীরের চামড়া একেবারে কালো হয়ে গেল।

পার্বতীও করেছিলেন তাই পঞ্চতপার তপস্যা শিবের জন্য। কিন্তু শ্রীমা করলেন কার জন্যে? জিজ্ঞেস করা হয়েছিল শ্রীমাকে। তিনি শুধু হেসে বলেছিলেন, 'এত সাধারাণ মানুষের মতই খায়-দায়—একটা ব্রত পাঠও করে না—লোকে একথা বলতে পারে, তাই পঞ্চতপা করেছিলুম।'

মা নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলেন না হয়তো।

॥ স তে রো ॥

....

একবার কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি আসছেন শ্রীমা সারদামণি। সঙ্গে আছে শিবু একখানা পুঁটলি হাতে। জয়রামবাটির কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ শিবু মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রীমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, একটা কথার যদি পরিষ্কার জবাব দাও—তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব। তা নয়তো এখানেই বসে থাকব।'

'সে কিরে?' কি কথা বলনা খুলে শ্রীমা বললেন।

শিবু চট করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে বলতো?'

শ্রীমা উত্তরে একটু হেসে বললেন, 'এই দেখ, এটা কি একটা প্রশ্ন হল? আমি আবার কে? তুই জানিস না? আমি যে তোর খুড়ি —এও আবার বলে দিতে হবে নাকি?'

'তাহলে যাও। আমি আর তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।' শি কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

এবার শ্রীমা যেন একটু ফাঁপরে পড়লেন। তবুও আবার বললে 'আমি একজন মহিলা—তোর খুড়ি।'

'ঠিক আছে যাও, আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না। ঐতে দেখা যায় জয়রামবাটি। এখন তুমি একাই যেতে পারবে।' —শি অভিমানের সুরে বলে।

অগত্যা শ্রীমা আর কি করেন? আবরণের অন্তরালে তাঁর চিন্ময়ী সত্ত্বা আছে, সে কথাই বললেন একটু ঘুরিয়ে। তিনি বললে 'লোকে বলে আমি নাকি শ্যামা মা।' এবার শিবু বেশ একটু নে চড়ে উঠল। বলল, 'শ্যামা মা! ঠিক?'

শ্রীমা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

'এবার তবে চল'—শিবু মাকে নিয়ে এল জয়রামবাটিতে।

শ্রীমা জয়রামবাটিতে এসে দেখেন ভয়ানক অবস্থা। সামান্য সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়ে গেছে। সারদামণির চার ভাই—প্রসন্নকুমার, বরদাপ্রসাদ, কালীকুমার আর অভয়চরণ। কারুরই তেমন অবস্থা নয়—অথচ সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তিটুকু নিয়ে চার চার ভাইয়ে দিন রাত ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি।

এখন দিদিই তাঁদের একমাত্র ভরসাস্থল। তাঁদের আশা, দিদি হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। শ্রীমা এসে ভাইদের সংসারে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ভাইদের সংসারে রান্না-বান্না করেন, ধান সেদ্ধ করেন, ছেলেমেয়েদের পরিচর্যা করেন, তবুও কি তাঁদের মন পাওয়া যায়? ভাইদের ঝগড়া-ঝাটিতে তিনি কোন ভাইয়ের পক্ষে কথা বললে অন্য ভাই রুষ্ট হয়ে যান। শুরু হয়ে যায় গালাগাল। শ্রীমা সব নীরবে সহ্য করেন॥

এর মধ্যে আবার দেখা দিল আরেক বিপত্তি। শ্রীমায়ের মাতা-ঠাকুরাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভাইদের ঝগড়াঝাটি চরমে গিয়ে উঠল। আর বাড়ির বৌয়েরাই বা কম কোথায়? সামান্য ব্যাপার নিয়ে ওঁদের মধ্যে গালিগালাজ তো লেগেই আছে। সারদামণি চিন্তা করে দেখলেন, অশান্তি আর বাড়িয়ে লাভ নেই। তিনি খবর দিয়ে কলকাতা থেকে আনালেন শরৎ মহারাজকে। ভাইদের, মধ্যে একটা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবার জন্য তিনি শরৎ মহারাজকে বললেন।

শরৎ মহারাজ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবার পর শ্রীমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোন অংশে থাকবেন।

শ্রীমা বললেন, 'আমার জন্য কিছু ভেবো না। আমি কখনো এঘর কিংবা ওঘরে থাকব।'

কিন্তু শ্রীমায়ের বেশির ভাগ টান প্রসন্নর দিকে। প্রসন্নর রয়েছে প্রথম পক্ষের দু'টি মেয়ে—নলিনী আর মাকু। দ্বিতীয় পক্ষের বউ সব ঝামেলা সামলিয়ে উঠতে পারে না। তাই মায়ের মন পড়ে থাকে নলিনী আর মাকুর দিকে।

মায়ের ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অভয়। উনি একটু লেখা-পড়া শিখে ডাক্তারি করতেন। তিনিও অকালে ঝরে গেলেন। কলেরায় তার জীবনদীপ নিভে গেল। মৃত্যুর পূর্বে অভয়চরণ শ্রীমাকে বলে গেলেন, 'দিদি, তুমি ওদের একটু দেখো।'

একে দারিদ্র্যের করাল ছায়া—তার উপর বিপদের পর বিপদ। শ্রীমা যেন চতুর্দিকে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। অভয়চরণের মৃত্যুর পর ওর স্ত্রী সুরবালা পাগল হয়ে গেল আর সেই পাগল অবস্থায় একটি মেয়ে প্রসব করল। সেই মেয়ের নাম রাখা হল রাধারাণী বা রাধু।

রাধারাণী জন্মাবার পর শ্রীমায়ের সাংসারিক দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, সংসারের এই মোহিনী মায়ায় তিনি নিজেকে জড়াবেন না মনকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাবেন। তখন হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুরের কথা।

ঠাকুর দেহত্যাগ করবার পর মায়ের মন যখন শূন্যতায় খাখা করছে, তখন একদিন তিনি দেখতে পেলেন লাল কাপড় পরিহিতা একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে তাঁর সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপরই ঠাকুর স্বয়ং দেখা দিয়ে বললেন, 'এই মেয়েটিকেই আশ্রয় করে তুমি থেক।'

একদিন শ্রীমা দেখতে পেলেন পাগলা সুররালা কতকগুলো কাঁথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর হামাগুড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পেছনে পেছনে চলেছে সুরবালার মেয়ে রাধু। মায়ের বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাঁর মনে হল, ঠাকুর এই মেয়েটির কথাই ইঙ্গিত করেছেন। অমনি ছুটে গিয়ে রাধুকে কোলে তুলে নিলেন সারদামণি। ঠিক সেই সময়েই ঠাকুরও আবার দেখা দিয়ে বললেন, 'এই সেই মেয়ে।

একে আশ্রয় করেই তুমি থাকবে।'

রাধু কাছে না থাকলে মায়ের যে খাওয়া হয়না, ঘুম হয় না। পিসিকেই রাধু মা ডাকে। এ যেন মহামায়া একেবারে বাঁধা পড়লেন সংসারে। সন্ন্যাসিনী না হয়ে সংসারী হয়েই তিনি বুঝতে চাইলেন সংসারের যন্ত্রণা। তাইতো শ্রীমা হয়ে উঠলেন ক্ষমা, দয়া ও মমতার প্রতিমূর্তি।

জয়রামবাটিতে মাকুর ছেলের ভয়ানক অসুখ হয়েছে—'ডিপথিরিয়া'। মাকুর এই ছোট্ট ছেলেটিই একদিন জয়রামবাটিতে কতকগুলো গুলঞ্চ ফুল কুড়িয়ে এনে শ্রীমায়ের পায়ে ঢেলে দিয়েছিল। মাকে প্রণাম করে মায়ের পা থেকে কয়েকটি ফুল নিয়ে জামার পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

ওইটুকু ছেলেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফুল লাল হল কি করে?'

শ্রীমা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঠাকুর করেছেন।'

'কেন করেছেন?'—আবার শিশুর প্রশ্ন।

'ঠাকুর নিজেকে রাঙাতে চান বলে'—শ্রীমা বললেন।

মাকুর ছেলে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তবেতো যে গাছে ফুল ফোটে, সেই গাছও ঠাকুর।'

মাকুর ছেলের অসুখের সময়ে শ্রীমা কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে ছিলেন। সেখানে সন্ধ্যার সময়ে খবর গেল যে, অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। মায়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। পরের দিন সকালবেলাতেই তিনি যাবেন দেখতে—পালকি ঠিক করে রাখতে বললেন।

কিন্তু খুব সকালেই ফিরে এল বৈকুণ্ঠ। তাকে দেখেই শ্রীমা বুঝতে পারলেন যে, মাকুর ছেলে আর জীবিত নেই। তিনি মনকে দৃঢ় করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কটা নাগাদ মারা গেছে?'

বৈকুণ্ঠ বলল, 'সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। বৈকুণ্ঠ আরও জানাল যে, মৃতদেহ সৎকার করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

তখন শ্রীমা কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। একটু প্রকৃতিস্থ হবার পর শ্রীমা বললেন, হয়তো কোন ভক্ত এসে জন্মগ্রহণ করেছিল—নইলে তিন বছরের ছেলের এত বুদ্ধি হয় কখনো।'

॥ আ ঠা রো ॥

চন্দ্রমণি দেবীর মৃত্যুর পর ঠাকুর একদিন শ্রীমাকে বলেছিলেন, 'গয়ায় গিয়ে বিষ্ণুর পাদপদ্মে আমার মায়ের পিণ্ড দিও।'

শ্রীমা সারদামণি সেকথা মনে রেখেছিলেন। তিনি একদিন বলেছিলেন, 'আমি গয়ায় যাব।' অমনি ভক্তরা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন।

সব ব্যবস্থাদি পাকা হয়ে যাবার পর শ্রীমা রওনা হলেন গয়ার উদ্দেশ্যে। গয়াতে পিণ্ডদান করে একদিন গেলেন তিনি বুদ্ধ গয়ায়। বুদ্ধ গয়ার সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির ও সেখানকার ব্যবস্থাপনা দেখে শ্রীমা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানালেন, 'আমাদের ছেলেদের জন্যও এমনি একটি স্থান করে দাও—যাতে ওরা আশ্রয়ের অভাবে কষ্ট না পায়।'

একদিন ভক্তদের কাছে শ্রীমা সেই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। ওঁরাও বুঝতে পারলেন—সত্যিইতো একটা মঠের একান্ত প্রয়োজন।

গয়াধাম থেকে ফিরে এলেন শ্রীমা। এবারে তিনি এসে উঠলেন বেলুড়ে এক ভাড়াটে বাড়িতে। গঙ্গার ধারে সুন্দর বাড়িটি। সে বাড়িতে প্রায় ছয় মাসকাল শ্রীমা কঠোর তপস্যায় কাটান। একদিন ধ্যান ভঙ্গ হবার মুহূর্তে শ্রীমা বলে উঠলে, 'ওরে যোগীন, আমার হাত কই? পা কই?' এভাবে তিনি সম্পূর্ণ দেহজ্ঞানের উর্ধ্বে এক উচ্চতম সমাধি অবস্থায় উঠে যেতেন। সে সময়ে তিনি নানা উজ্জ্বল বর্ণের জ্যোতি দর্শন করতে থাকেন।

কিছুদিন পর শ্রীমার আবার কি খেয়াল হল, বললেন, পুরীর

জগন্নাথধামে যাব। কিছু দিনের মধ্যেই শ্রীমা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মী দিদি ও আরও কয়েকজন ত্যাগী ভক্ত নিয়ে পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

সে সময়ে পুরী যাবার রেলপথ হয়নি। শ্রীমা কলকাতা থেকে জাহাজে করে গেলেন চাঁদবালি। সেখান থেকে জাহাজে করে কটকে। কটক থেকে গরুর গাড়িতে করে এলেন শ্রীক্ষেত্রে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কখনও জগন্নাথ দর্শনে আসেন নি। সেজন্য শ্রীমা ঠাকুরের একখানা ফটোও সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্রীমা সারদামণিকে জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য পালকির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে ব্যবস্থা করেছিলেন জগন্নাথদেবের মন্দিরের একজন পাণ্ডা গোবিন্দ শিঙ্গারী। তিনি শ্রীমায়ের কথা আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু শ্রীমা পালকি করে মন্দিরে যেতে চাইলেন না। তিনি বললেন, 'প্রভুর মন্দিরে দীন-হীন কাঙালের মতই আমাদের যাওয়া উচিত। আমি হেঁটেই যাব।'

মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীমা জগন্নাথদেবের সামনে চোখ বুজে বসে রইলেন।

যোগীন-মা তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন; বললেন, 'একি! তোমার চোখের সামনে জগন্নাথদেব, আর তুমি কিনা চোখ বুজে আছ?'

শ্রীমা বললেন, 'আগে উনি দেখুন, তারপর আমি দেখব।'

দেখা গেল, শ্রীমা ঠাকুরের একখানা ফটো বার করে ধরে রেখেছেন।

ঠাকুরকে আগে দর্শন করিয়ে এরপর শ্রীমা চোখ খুললেন।

দর্শন করতে করতে এক সময়ে শ্রীমার মনে হল, জগন্নাথদেব যেন রত্নবেদীতে বসে আছেন আর শ্রীমা তাঁর সেবা করছেন। শ্রীমা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। একি সত্যি ঘটনা না প্রহেলিকা?

পুরীতে চারমাস কাটিয়ে শ্রীমা ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় তিনি কিছুদিন ছিলেন মহেন্দ্র দত্তের (মাস্টার মহাশয়) বাড়িতে।

সে সময়ে ভক্ত বলরাম বসু খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন—বাঁচবার আশা কম। খবর পেয়েই শ্রীমা চলে গেলেন বলরাম বসুর বাড়িতে। কয়েকদিনের মধ্যেই বলরাম বসু পুণ্যলোকে চলে গেলেন।

শ্রীমা মনে খুব ব্যথা পেলেন। কিছুদিন কাটালেন তিনি বলরাম বসুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে। এরপর এলেন তিনি বেলুড়ের কাছে ঘুসুরীতে। সেখানে প্রায়ই তিনি গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকতেন। ঘুসুরীতে এসেই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে পরিব্রাজক বেশে দেশ পর্যটনে বেরিয়ে গেলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মর্মবাণী বিদেশে প্রচারের জন্য তিনি মাদ্রাজ হয়ে চলে গেলেন আমেরিকার চিকাগো শহরে। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি শ্রীমায়ের আশীর্বাদ কামনা করে পত্র দিলেন।

শ্রীমা এলেন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। একদিন ধ্যানে বসে তিনি দেখতে পেলেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে গঙ্গায় মিশে যাচ্ছেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ গঙ্গার জল অঞ্জলি করে নিয়ে 'জয়রামকৃষ্ণ, জয়রামকৃষ্ণ' বলে সেই জল চারদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। সাথে সাথে অগণিত ভক্ত নর-নারী জ্ঞান-ভক্তি লাভ করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমায়ের বুঝতে বাকী রইল না যে, ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে দিয়ে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করাতে চান। তাই বিদেশযাত্রা বিবেকানন্দের পক্ষে বিপদসঙ্কুল হলেও, তিনি প্রসন্ন মনে তাঁকে বিদেশযাত্রার অনুমতি দিলেন। পরবর্তী সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'শ্রীমায়ের আশীর্বাদেই আমি এক লাফে হনুমানের মত সাগর অতিক্রম করেছি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি।

এরপর শ্রীমা এলেন জয়রামবাটিতে। নটসম্রাট গিরীশ ঘোষ এসে একদিন হাজির হলেন সেখানে।

গিরীশ ঘোষের একবার কলেরা হয়েছিল। বাঁচবার আশা ছিল কম। একদিন অসুস্থ অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন মাতৃবেশে এক স্নেহময়ী রমণী তাঁর শিয়রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অল্প বয়স থেকেই গিরীশবাবু মাতৃহারা। মায়ের চেহারাও তাঁর ভাল মনে নেই। ভাবলেন, তাঁর স্বর্গগত মা-ই হয়তো তাঁকে স্বর্গলোকে নিয়ে যেতে এসেছেন। কিন্তু মা যেন তাঁকে কি খেতে দিলেন। বললেন, 'এ মহাপ্রসাদ তুমি খাও। এই প্রসাদ খেলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

সত্যি সত্যিই গিরীশ ঘোষ মহাপ্রসাদ খেয়ে ভাল হয়ে উঠলেন।

কালীঘাটের মহাপীঠস্থানে শনি-মঙ্গলবারের রাত্রে এসে হাজির হন গিরীশ ঘোষ। সেখানে বলির হাড়-কাঠের পাশে বসে 'মা-মা' বলে কাঁদেন গিরীশ ঘোষ—যদি মা একবার তাঁর দিকে কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এই ভরসায়। কিন্তু কোন অনুভূতিই হয়না গিরীশ ঘোষের।

একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে ধরে বসলেন গিরীশ ঘোষ—ঠাকুরের কাছে যাবার পথ বাৎলে দেবার জন্য।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বললেন, 'মায়ের কাছে যাওনা কেন? সেখানে গেলে তো অনেক শান্তি পাবে। মা আর ঠাকুর তো আলাদা নন। রাধা-কৃষ্ণকে যেমন পৃথক সত্ত্বা বলে চিন্তা করা যায় না, তেমনি হচ্ছেন রামকৃষ্ণ-সারদামণি। চল, একবার তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাই।'

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কথায় পুণ্যধাম জয়রামবাটিতে এলেন গিরীশ ঘোষ।

আগে তিনি কখনো শ্রীমায়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন নি। এবার শ্রীমায়ের দিকে তাকালেন তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে। তাকিয়েই গিরীশ ঘোষ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একি! যে মাতৃমূর্তি তিনি অসুস্থ অবস্থায় তাঁর শিয়রের পাশে দেখেছিলেন, এ যে সেই মূর্তি।

গিরীশ ঘোষ হাত জোড় করে শ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রশ্ন রাখলেন, 'তুমিই কি সেই মাধুর্যময়ী কৃপাসাগরী, প্রসন্না ও বরদারূপে আমাকে দেখা দিয়েছিলে ?'

শ্রীমায়ের ক্লান্তিহরা হাসি দেখেই গিরীশ ঘোষ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তিনিই সেই মা !

গিরীশ ঘোষ লুটিয়ে পড়লেন শ্রীমায়ের পাদপদ্মে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাদের পাতানো মা ?'

শ্রীমায়ের স্পষ্ট জবাব, 'আমি তোমাদের সত্যিকারের মা। গুরু-পত্নীরূপেই শুধু মা নই।'

'আমিই একমাত্র অধিশ্বরী, পার্থিব ও অপার্থিব ধনদাত্রী। আমিই সর্বাশ্রয়দাত্রী মহামায়া।'

শ্রীমায়ের স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শটায় গিরীশ ঘোষ শান্তি খুঁজে পেলেন।

ঘুমাতে গিয়ে গিরীশ ঘোষ সত্যিকারের মায়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাঁর বিছানা-পত্র সব ধবধবে সাদা। শ্রীমা নিজের হাতে কেচেছেন গিরীশ ঘোষের জন্য। শুতে গিয়ে গিরীশ ঘোষের চোখে জল। মায়ের অপার করুণার আনন্দে তাঁর চোখে জলধারা।

গিরীশ ঘোষ শ্রীমায়ের কাছে সন্ন্যাস নেবার বাসনা জানালেন। শ্রীমা গর্জে উঠলেন। বললেন, 'তুমি বই লিখছ, নাটক লিখছ—এও ঈশ্বরের কাজ। নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যসাধনা করলে তুমি এর ভিতর দিয়েই ঈশ্বরের সেবা করতে পারবে।'

কলকাতায় ফিরে গেলেন গিরীশ ঘোষ। শ্রীমা সারদামণিকে চিঠি লিখে জানালেন যে, এবার তাঁর বাড়িতে শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানে মাকে অবশ্যই আসতে হবে।

পূজার সময়ে শ্রীমা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ হলে কি হবে ? ছেলের আহ্বানে তো সাড়া না দিয়ে পারবেন না তিনি।

জয়রামবাটিতে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে শ্রীমায়ের শরীর একেবারে

ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। অসুস্থ শরীর নিয়ে মায়ের পক্ষে কলকাতা যাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্তানের আহ্বানে মাকে সাড়া দিতেই হল। রওনা হলেন তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু কলকাতায় তখন আরেক উৎপাত শুরু হয়ে গেছে। আরম্ভ হয়েছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। মাস্টার মশাই আর ললিতবাবু গিয়ে হাজির হলেন বিষ্ণুপুরে মাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

অনেক ঝুঁকি নিয়ে শ্রীমা এসে পৌঁছালেন কলকাতায়। উঠলেন বলরাম বোসের বাড়িতে। সেখানে মাকে দর্শন করবার জন্য, মায়ের পায়ে ফুল-বেলপাতা দেবার জন্য সেকি ভিড়! জ্যান্ত দুর্গাকে আরাধনা করার জন্য সবারই কি ব্যস্ততা! সমস্ত শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে শুধু পা দুখানি খোলা রেখে সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীমা কত কুণ্ঠা নিয়ে। ফুলে আর বেলপাতায় যেন এক পাহাড় হয়ে গেল। তবুও কি ভক্তদের আনাগোনার বিরাম আছে?

এই অবস্থাতেই শ্রীমায়ের গায়ে দেখা দিল জ্বর। হাড়-কাঁপুনি জ্বর গায়ে নিয়েও তিনি মহাষ্টমীর দিন আবার দাঁড়ালেন ভক্তদের অভিলাষ পূর্ণ করতে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারলেন না। জ্বরের ঘোরে তাঁকে শয্যা নিতে হল। গভীর রাত্রে হবে সন্ধি পুজো। গিরীশ ঘোষের বাড়িতে খবর গেল—হঠাৎ শ্রীমায়ের জ্বর বেড়ে গেছে—তাঁর পক্ষে গিরীশ ঘোষের বাড়ি যাওয়া সম্ভবপর নয়। গিরীশ ঘোষ এ দুঃসংবাদ পেয়ে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত কেবল 'মা-মা' বলে চীৎকার করতে লাগলেন।

কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার! হঠাৎ মধ্যরাত্রে শ্রীমা বিছানায় উঠে বসেছেন। ডেকে তুললেন গোলাপ-মাকে। বললেন, গিরীশ আমাকে ডাকছে। আমি যাব গিরীশের বাড়ি এখুনি, এই দণ্ডে।'

সরু গলি ধরে চললেন শ্রীমা। সঙ্গে আছেন গোলাপ-মা।

জ্বরের ঘোরে পা টলছে—তবুও তিনি এগিয়ে চলেছেন।

গভীর রাত। গিরীশ ঘোষের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রীমা দরজায় টোকা দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'গিরীশ আমি এসেছি।' কে একজন ক্ষিপ্র গতিতে খুলে দিল দরজা।

শ্রীমা গিরীশ ঘোষের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন। অমনি চারদিক থেকে সমস্বরে আওয়াজ উঠল, 'মা এসেছেন, মা এসেছেন।' মেয়েরা উলুধ্বনি দিতে লাগল। শ্রীমা দেবীপ্রতিমার মতই দাঁড়িয়ে রইলেন প্রতিমার সামনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সমাধিস্থা হয়ে গেলেন। অমনি সবাই মুঠো মুঠো ফুল বেলপাতা এনে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে লাগল।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য! মৃন্ময়ী প্রতিমার পাশে চিন্ময়ীর আরাধনা করে সবাই কৃতার্থ।

॥ উ নি শ ॥

শ্রীমা বেশ কিছুদিন রইলেন কলকাতায়। কিন্তু জয়রামবাটিতে যাবার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল। সেখানে রয়েছে তাঁর বিরাট সংসার। সে সংসার কত বিচিত্র। এই বিচিত্র সংসারের সব কিছু তাঁকে সামলাতে হয়। হাতে-কলমে তিনি এখন সংসার করছেন। সংসারের যন্ত্রণা তিনি বুঝতে পেরেছেন বলেই তো তাঁর এত কৃপা, এত করুণা।

জয়রামবাটিতে আছে সুরবালার মেয়ে রাধারানী। ওকে তিনি সব সময়ে আগলে রাখেন। আর আছে, তাঁর ভাই প্রসন্নকুমারের দু'টি মেয়ে—নলিনী আর মাকু। তাদের মায়াতেই শ্রীমা বাঁধা পরে রয়েছেন।

জয়রামবাটি রওনা হবার কয়েকদিন আগেই সারদামণি দেশে কালীকুমারকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। দেশড়া গ্রামে পালকি রাখার কথা লিখেছিলেন। একটা চিঠি নয়, পরপর দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন।

সারদামণি এলেন বিষ্ণুপুরে। সাথে আছে গোলাপ-মা আর কুসুম। এরা তো এক রকম জোর করেই শ্রীমায়ের সাথে এসেছেন।

বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে কোতলপুর হয়ে এলেন দেশড়া গ্রামে। কিন্তু পালকির দেখা নেই। সন্ধ্যের অন্ধকারও প্রায় ঘনিয়ে এল। চারিদিকে শুধু খাঁ খাঁ করছে মাঠ। শ্রীমায়ের ভাইয়েরা পালকিও পাঠালেন না, কিংবা নিজেরাও কেউ এলেন না। 'অথচ শ্রীমা ভাইদের জন্য কিনা করেছেন। প্রথমে ভাইয়েরা তো তাঁকে বোঝা বলেই মনে করতেন, এরপর এঁরা দেখতে পেলেন দিদির কত খাতির।

ভক্ত সংখ্যা কত! ভক্তরা দিদির জন্য খরচের টাকা পাঠায় আর কত কি করে। তাই দিদির কাছ থেকে ছিটে-ফোঁটা কিছু পাবার আশায় ওঁরা আনাগোনা করেন। এ নিয়ে আবার ওঁদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটিও বেঁধে যায়। এসব ঝামেলা থেকে অব্যাহতি লাভ করবার জন্যে শ্রীমা ভাইদের বাড়ির সীমানার বাইরে একটা ঘর তুলে নিয়েছিলেন।

এখন দেশড়া থেকে জয়রামবাটি কিভাবে যাবেন সেটাই সারদা-মণির কাছে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দেশড়া থেকে জয়রামবাটি হেঁটে বা পালকিতে করে যাওয়া যায়। গরুর গাড়ি করে যেতে হলে যেতে হবে শিহড় ঘুরে। আর সে পথও খুব খারাপ। সেজন্যই তো কালীকুমারকে পালকির কথা লেখা হয়েছিল। এখন ভাইদের কাণ্ড দেখে শ্রীমা তো অবাক।

শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত হল। দেশড়ার বড় মাঠ পেরিয়ে নদী। নদী পেরিয়ে আবার মাঠের মধ্য দিয়ে খানিকটা পথ যাবার পরই জয়রামবাটি।

এর মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। অথচ সাথে কোন রকম আলোর ব্যবস্থা নেই। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্য দিয়েই শ্রীমা অন্যান্যদের সাথে হেঁটে চললেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে আছে একটি কালো রঙের টিনের বাক্স—এটি তাঁর কাছে একটা অমূল্য সম্পদ। তাই টিনের বাক্সটির ভেতরে আছে সিংহবাহিনীর মাটি, জপের মালা শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো—আরও কত কি খুঁটিনাটি। আশু সে বাক্স বহন করে নিয়ে চলেছে।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে যাবার পর সুরবালা বলে উঠল, 'এদিক দিয়ে কোথায় চলেছ? এটা তো জয়রামবাটির পথ নয়! চল, আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে সুরবালা অন্য পথ দিয়ে নিয়ে চলল।

শ্রীমা ভাবলেন, সুরবালা তো মাঠে মাঠেই ঘুরে বেড়ায়। ও

নিশ্চয়ই চিনবে ঠিক পথ। আশুও এই পথ দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছে। সেও মেনে নিল সুববালার নির্দেশ। কিন্তু অনেক দূরে হেঁটে যাবার পরও এরা নদীর ঘাটের কোন হদিশ পেল না। তখন সবাই মিলে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

দূরে হঠাৎ একটা আলোর রশ্মি ভেসে উঠল। একটা লোক আলো নিয়ে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। শ্রীমা ডাকলেন ওকে। বললেন, 'তোমার আলোটা একটু এদিকে ধরো, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

ধীরে ধীরে লোকটা আলো নিয়ে এগিয়ে এল। ওকে জিজ্ঞেস করায়, সে সঠিক পথ বাৎলে দিল।

শ্রীমা এসে পৌঁছলেন জয়রামবাটি। পৌঁছেই এক ঘটি জল খেলেন। তেষ্টায় তাঁর বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। কালীকুমার মাথা নীচু করে দিদির সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। সারদামণির চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ তিনি দিলেন। পালকির ব্যাপারে নানা অজুহাত দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু কোনটাই ধোপে টেঁকে না। আসল কথা, শ্রীমায়ের প্রতি ভাইদের চরম উদাসীন্য।

শ্রীমা আছেন জয়রামবাটিতে। একদিন একজন বয়স্ক লোক কোত্থেকে এসে হাজির হলেন শ্রীমাকে প্রণাম করবেন বলে। দূর থেকে লোকটাকে দেখেই শ্রীমা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ভদ্রলোকটি বাইরে থেকেই নমস্কার করলেন। কিন্তু বায়না ধরলেন, পায়ের ধুলো তো চাই। অনেক পীড়াপীড়ির পর শ্রীমা দাওয়ায় এসে জলচৌকিতে আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। আর লোকটি একরকম জোর করেই ছিনিয়ে নিলেন মায়ের পায়ের ধুলো। আর যায় কোথায়! সেই সময় থেকেই মায়ের পায়ে জ্বালা শুরু হয়ে গেল।

একদিন পুলিসের এক দারোগাবাবু এসে হাজির হলেন শ্রীমায়ের কাছে। চেহারা হাবভাবে খুব দাম্ভিকতা স্পষ্ট। অনেক কুকর্মের নায়ক তিনি। এসে বললেন, 'মায়ের পায়ের ধুলো চাই।' শ্রীমা পায়ের ধুলো

দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু হালুয়া করে পাঠিয়ে দিলেন ওর সরকারী আবাসে।

জয়রামবাটিতে একটি অল্প বয়সের ভক্ত বেশ কিছুদিন ধরে আছে। কলকাতা থেকে এক জরুরী বার্তা পেয়ে মহালয়ার অন্ধকারের মধ্যেই সে কলকাতা রওনা হবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগল।

শ্রীমা কি রকম যেন একটা অশুভ সঙ্কেত পেলেন। সেদিন রাত্রে তিনি ছেলেটিকে কোন অবস্থাতেই যেতে দিলেন না। পরের দিন গেল ছেলেটি। সেদিন রাত্রে রওনা হলে শত্রুরা ওকে গুম্ করে ফেলত। এরকম একটা ষড়যন্ত্র চলছিল। শ্রীমায়ের নিষেধ বাক্যে ছেলেটি রক্ষা পেয়ে গেল। কাজেই মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করতে নেই।

কত ভক্ত যে কতভাবে শ্রীমাকে জ্বালাতন করেছে তার কি কোন লেখা-জোখা আছে! একদিন শ্রীমা সবে মাত্র পুজো সেরে উঠছেন, ঠিক সেই সময়ে এক ভক্ত কতকগুলো ফুল নিয়ে এসে বলল, 'মাকে পুজো করব।' শ্রীমা সারা গা চাদর মুড়ি দিয়ে তক্তপোশে এসে বসলেন। পা দুখানি অনাবৃত। ভক্ত তো মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করে ন্যাস, প্রাণায়ম কতাকি শুরু করে দিল। শ্রীমা তো সেখানে বসে বসে ঘেমে একেবারে অস্থির। কিছুই বলতে পারছেন না এই অবুঝ ভক্তটিকে। শেষ পর্যন্ত শ্রীমাকে এসে উদ্ধার করলেন গোলাপ-মা। এক ঝামটা মেরে ভক্তটির হাত ধরে টেনে তুললেন তিনি। বললেন, 'একি তুমি মাটির ঠাকুর পেয়েছ যে প্রাণায়াম করে তাঁকে চেতন করবে? ইনি তো জ্যান্ত দুর্গা। তোমার ভাবের ঠেলায় জ্যান্ত দুর্গার প্রাণ যে প্রায় ওষ্ঠাগত।'

পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলা থেকে এক ভক্ত এসেছে—শ্রীমায়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী। ভক্তরা যখন তখন এসে শ্রীমায়ের অসুস্থ শরীরেও বিরক্ত করে বলে স্বামী সারদানন্দ সাক্ষাৎ প্রার্থীদের উপর কিছুটা

বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন। তাই সেবকরা ভক্তটিকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। এই নিয়ে ভক্তটির সঙ্গে একটু বচসাও হয়ে গেল।

ঠিক তখনই শ্রীমা এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে। অমনি ছেলেটি নির্ভয়ে চলে এল শ্রীমায়ের কাছে।

শ্রীমা স্নেহের সুরে বললেন, 'তুমি কাল এস। কালকে তোমাকে দীক্ষা দেব।'

আরেকদিন একটি অদ্ভুত ধরনের ছেলে এসে শ্রীমায়ের পায়ে জোরে জোরে মাথা ঠুকতে লাগল। শ্রীমা অস্ফুট কাতর শব্দ করে উঠলেন। ছেলেটি অমনি বলে উঠল, 'মনে রাখার মত যোগ্যতা তো আমার কিছু নেই। তাই আপনার পায়ে ব্যথা দিয়ে দিলাম—যদি মনে রাখেন।'

শ্রীমা অনেকের কাছে এই গল্প করে হেসেছেন।

একদিন শ্রীমা ধ্যানে বসেছেন। হঠাৎ কোত্থেকে সুরবালা এসে গালাগাল শুরু করে দিল, 'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক' বলে। পূজা শেষ হয়ে যাবার পর শ্রীমা শুধু বললেন, 'ওরা তো জানে না আমার স্বরূপ।'

রাধুর স্বামী মন্মথ জলে ডুবে গেছে বলে একদিন চীৎকার শুরু করে দিল সুরবালা। চীৎকার শুনে শ্রীমা বাইরে এসে দেখেন সুরবালা ভিজে কাপড়ে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ে রয়েছে। জামাইকে খোঁজার জন্য সুরবালা নিজেই জলে নেমেছিল। জলে মন্মথকে পাওয়া যায়নি।

হঠাৎ শ্রীমাকে দেখে সুরবালা গর্জে উঠে বলল, 'ঠাকুরঝি, এ সমস্ত তোমরাই কাজ। তুমি মন্মথকে পুকুরে ডুবিয়ে মেরেছ। আমার সুখ তোমার সহ্য হয় না।'

শ্রীমা সত্যি-সত্যিই এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। একজন এসে বলল, 'মন্মথকে তো দোকানে দেখে এলুম। সেখানে বসে সে তাস খেলছে।

মন্মথকে খবর দেওয়া হল। অমনি মন্মথ সশরীরে এসে হাজির তখন পাগলীর রাগ কমল।

একদিন বিকেলে তরকারি কাটছিলেন শ্রীমা। হঠাৎ সুরবাল সেখানে এসে মাকে বলল, 'তুমি আফিং খাইয়ে রাধুকে বশ করে ফেলেছ। আমার মেয়েকে আমার কাছে ঘেঁষতে পর্যন্ত দাও না।'

শ্রীমা বললেন, 'তোর মেয়ের জন্য আমার ভারী বয়ে গেছে নিয়ে যা না ওকে—ওখানে পড়ে রয়েছে।'

'দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি মজা'—বলে পাগলী ছুটে গিয়ে নিয়ে এল একটা চেলা কাঠ শ্রীমাকে মারতে। প্রায় মাথায় বসিয়ে দিয়েছিল আর কি। এমন সময়ে একটি ভক্ত মেয়ে এসে রুখে দাঁড়াল। সুরবালার হাত থেকে চেলা কাঠটি ছিনিয়ে নিল।

শ্রীমা দেখেশুনে হঠাৎ রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন, বলে ফেললেন অসতর্ক মুহূর্তে, 'যে হাত দিয়ে তুই আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছিস— সে হাত তোর খসে পড়বে।' বলে ফেলেই শিউরে উঠলে শ্রীমা ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে করজোড় প্রার্থনা করে বললেন, 'ঠাকুর আমি একি করলাম! আমার মুখ দিয়ে এরকম শাপ-শাপান্ত বেরিয়ে গেল। তুমি ওকে রক্ষা কর।'

এই সুরবালা, রাধু, নলিনী, মাকু এদের নিয়েই মায়ের বিচিত্র সংসার। এই যন্ত্রণার সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকলে কি হয়? সন্ন্যাসিনী না হয়ে শ্রীমা সংসারী হয়েছেন একটা কিছু অবলম্বন করে মায়ার রাজ্যে অবস্থান করার জন্য—জীব জগতের উদ্ধারের জন্য।

একদিন শ্রীমায়ের একটি ভক্ত মেয়ে রাধারানীর জন্য একজোড় শাঁখা কিনে নিয়ে এল। কিন্তু রাধুকে পরাতে গিয়ে দেখে শাঁখা ছোট। অমনি রাধারানীর শুরু হয়ে গেল কান্না। শাঁখা রাধুর হাতে ঢুকল না বলে ভক্ত মেয়েটিরও কি কান্না!

শ্রীমা ব্যাপার কি জানতে চাইলেন। রাধু চেঁচিয়ে উঠল, 'এই

সুন্দর শাঁখাগুলো আমি পরব,—কিন্তু এগুলো আমার হাতে ঢুকছে না।'

'আয়তো দেখি, শাঁখা কেন তোর হাতে লাগে না'—শ্রীমা রাধুকে কাছে ডাকলেন। শ্রীমা শাঁখা নিয়ে বসে রাধুর হাত টিপে ধরলেন। অমনি শাঁখা ঢুকে গেল রাধুর হাতে।

'সুন্দর শাঁখা হয়েছে তোর'—শ্রীমা বললেন রাধুকে, 'তুই ঠাকুরকে, আমাকে আর এই বৌমাকে প্রণাম কর।'

অমনি ভক্ত মেয়েটি কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। বলল, 'আমি নীচু জাত—আপনাদের প্রণাম নিলে আমারই পাপ হবে।'

শ্রীমা বললেন, 'ভক্তদের শুধু একজাত।'

ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করে রাধু সেই ভক্ত মেয়েটিকেও প্রণাম করল। উল্টে আবার ভক্ত মেয়েটি রাধুকেও প্রণাম করল। শ্রীমা ব্যাপারখানা দেখে হাসতে হাসতে বললেন, 'কি হে প্রণামটা ফিরিয়ে দিলে?'

শ্রীমায়ের যে কতরকম জ্বালা! নলিনী একদিন রাগ করে শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে এল। সে আর কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে না। একদিন রাত্রিবেলা সবাই যখন ঘুমে অচেতন, নলিনীর স্বামী গরুর-গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হল নলিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। নলিনী তো কোন অবস্থাতেই ঘরের দরজা খুলবে না। ভিতর থেকে বলছে—'আমি আত্মহত্যা করব।'

শ্রীমা সারারাত লণ্ঠন নিয়ে বসে রইলেন দোরগোড়ায়। অনেক প্রবোধবাক্য শোনানোর পর শেষে ভোরবেলায় নলিনী দরজা খুলল।

একবার বসন্ত হয়েছিল শ্রীমায়ের। সেরে উঠেলেন বটে, তবে তখনও অন্ন পথ্য হয়নি। মায়ের বড় ইচ্ছা হল লুকিয়ে একটু ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবুবেন। একটি ভক্ত ছেলেকে কাছে পেয়ে বললেন মনের কথা। ছেলেটিও লুকিয়ে শালপাতায় করে ডাঁটা-চচ্চড়ি নিয়ে এল। শ্রীমা কেলমাত্র ডাঁটা-চচ্চড়ি মুখে পুরেছেন, অমনি সেখানে গোলাপ-মা

এসে হাজির। শাসনের সুরে বললেন, 'ওকি মুখ নড়ছে কেন?' শ্রীমা অপরাধীর মত বললেন, 'এই দুটো ডাঁটা চিবুচ্ছি মাত্র।'

'এই শুদ্দুর ছেলেটা বুঝি এনে দিয়েছে ডাঁটা?'—গোলাপ-মা জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীমা তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন মিষ্টি হেসে, 'আমার ছেলে কি কখনো শুদ্দুর হয় রে?'

একজন ভক্ত এসে একদিন শ্রীমাকে বলল, 'এত জপ-তপ করলুম কই কিছুই তো উন্নতি হল না।'

এও যেন মায়েরই অপরাধ। শ্রীমা ওকে তাই বুঝিয়ে দিলেন, 'আরে শাক-মাছ নয় যে টাকা দিয়ে কেনা যায়। চন্দন ঘষে ঘষে তবে গন্ধ বার করতে হয়। চেষ্টা করে করে নিজের মনের ময়লা কাটাও। তবেই তো ঠাকুরের কৃপা পাবে!'

স্বদেশী আন্দোলন করে একটি ছেলে পুলিসের নজরে পড়েছিল। তারও ইচ্ছা শ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়। মন্ত্র দেওয়া হল নির্জনে পুলিসের নজরের বাইরে এক মাঠের মধ্যে খড় পেতে বসে। সেই অভয় মন্ত্র পেয়ে ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের কাজে। এইভাবে কত ছেলেকে কতভাবে যে মন্ত্র দিয়েছেন শ্রীমা তার কোন লেখা-জোখা নেই।

অক্ষয় সেন নামে এক ভদ্রলোক একটি কুলি মেয়ের হাত দিয়ে শ্রীমায়ের কাছে কিছু সব্জি পাঠিয়েছিলেন। সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে শ্রীমা মেয়েটিকে ছেড়ে দিলেন না। মেয়েটি ছিল ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগী। মধ্য রাত্রে কাঁপুনি দিয়ে মেয়েটির প্রবল জ্বর এল—সাথে সাথে বমিও। শ্রীমা সারারাত বসে বসে মেয়েটির সেবা করলেন—নিজের হাতে বমি পরিষ্কার করলেন। এই না হলে কি মা?

॥ কুড়ি ॥

....

শ্রীমা সারদামণি এবার যাত্রা করলেন দক্ষিণ ভারতের দিকে। তাঁর সাথী হলেন রামকৃষ্ণানন্দ, আশুতোষ মিত্র এবং আরও কয়েকজন ভক্ত।

খুরদা পার হয়ে শ্রীমায়ের চোখে পড়ল চিল্কা হ্রদ। ভোরবেলা সারি সারি সাদা বক আকাশে উড়ে চলেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নীলকণ্ঠ উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখে শ্রীমা আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

বহরমপুরে কয়েকদিন থেকে শ্রীমা এলেন ওয়ালটেয়ারে। সেখানকার সুন্দর পাহাড়, ফুলের সমারোহ শ্রীমায়ের মনকে খুবই আকৃষ্ট করল।

ওয়ালটেয়ার থেকে শ্রীমা এলেন মাদ্রাজে। সেখানে মাদ্রাজী ভক্তদের আনাগোনার অন্ত নেই। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এসে শ্রীমাকে সুন্দর সুন্দর তামিল ভজন গান শুনিয়ে যেত। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীমা গিয়ে বসতেন সমুদ্রের তীরে। সমুদ্রের বিশালতা দেখে শ্রীমায়ের মন ভরে যেত।

মাদ্রাজে ইংরেজদের তৈরি বিখ্যাত দুর্গের কথা শ্রীমা শুনেছেন। একদিন গেলেন সেখানে দুর্গ দেখবার জন্যে। মাদ্রাজের শৈব ও শাক্ত মন্দিরগুলো তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন।

একদিন এক মাদ্রাজী যুবক এসে হাজির হল শ্রীমায়ের কাছে। বলল, 'রামকৃষ্ণদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার কথা বলেছেন। শ্রীমা দীক্ষা দিলেন যুবকটিকে। এভাবে অনেকে এসে দীক্ষা নিল মায়ের কাছ থেকে।

মাদ্রাজ থেকে মা সারদামণি গেলেন মাদুরায়। মাদুরার বিখ্যাত মন্দিরটি দেখে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী শ্রীমা প্রদীপ কিনে নিজের নাম লিখে শিবগঙ্গার পারে রেখে এলেন।

মাদুরা থেকে এলেন তিনি রামেশ্বরে। রামেশ্বরের মন্দিরে কারুকার্য দেখে শ্রীমা অভিভূত হয়ে গেলেন।

রামেশ্বরের ঠাকুর সোনার মুকুটে ঢাকা থাকে। সেই মূর্তি দেখতে হলে রামনাদ রাজার অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু শ্রীমা সারদামণির মূর্তি দর্শনে কোন অসুবিধা হয় নি। রামনাদের মহারাজাই মন্দির দর্শনের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্রীমা গঙ্গাজল ও বেলপাতা দিয়ে রামেশ্বরের পুজো করলেন।

রামনাদের দেওয়ান একদিন মণিকোঠা খুলে দিয়ে শ্রীমাকে পছন্দ মত হীরে জহরতের অলঙ্কার বেছে নিতে বললেন। মায়ের হাতে রয়েছে হোগলাপাকের বালা। সেই বালা খুলতে গিয়ে ঠাকুরের কাছে বাধা পেয়েছেন। এর চেয়ে অমূল্য অলঙ্কার আর কি হতে পারে? তাই তিনি রামনাদের দেওয়ানের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না।

রামেশ্বর থেকে মাদুরা ও মাদ্রাজ হয়ে শ্রীমা এলেন বাঙ্গালোরে। সেখানে দিনের পর দিন ভক্ত সমাগম হতে লাগল। বাঙ্গালোরে চন্দন গাছ দেখে শ্রীমায়ের কি আনন্দ! ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর বসে শ্রীমা জপ-ধ্যান করে সময় কাটান। এভাবে বেশ কিছুদিন দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করে মা সারদামণি ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতার ভক্তদের মনে আনন্দ আর ধরে না।

ঠাকুর গিরীশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীমাও সেকথা জানতেন। তিনি চৈতন্যলীলা দেখার সুযোগ পান নি।

এখন চৈতন্যলীলা দেখার প্রবল বাসনা জাগল মায়ের। কিন্তু

বইটির অভিনয় তখন বন্ধ।

গিরীশ ঘোষ শ্রীমায়ের অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারলেন। তিনি চৈতন্যলীলার এক বিশেষ অভিনয় রজনীর ব্যবস্থা করলেন। নিমাই-এর ভূমিকায় অভিনয় করত একটি মেয়ে। সে অভিনয় ছেড়ে দিয়েছিল।

গিরীশ ঘোষ মায়ের কথা বলতে মেয়েটি সহজেই অভিনয় করতে রাজী হয়ে গেল।

নিমাইয়ের অভিনয় দেখে মা মুগ্ধ হলেন। বললেন, 'মেয়েটি যথার্থই ভক্তিমতা। ও ভক্তিমতী না হলে এরকম অভিনয় করতে পারত না।'

গিরীশ ঘোষের অভিনয় দেখেও মা মহাখুশী। বুঝতে পারলেন তিনি, গিরীশ ঘোষের মধ্যে কি বিরাট প্রতিভা রয়েছে।

থিয়েটার শেষ হলে মাকে দেখার জন্য কি ভিড়। সবাই মায়েব পদধূলি নিতে চায়। শ্রীমা একে একে সবাইকেই আশীর্বাদ করলেন।

একদিন এক ইংরেজ মহিলা এলেন মায়ের কাছে। চোখে মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ। মহিলা খৃস্টান। তাই মায়ের কাছ থেকে একটু দূরে বসলেন। শ্রীমা ব্যগ্রতার সঙ্গে বিদেশী মহিলার কাছে বসে নানা কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

ইংরেজ মহিলাটি জানালেন যে, তার কন্যা গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তার বলেছে যে, বাঁচার আশা কম। তাই তিনি শ্রীমায়ের শরণাপন্ন হয়েছেন। ইংরেজ মহিলাটির ধারণা, শ্রীমায়ের আশীর্বাদ পেলে তার মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। মহিলাটি মনে করেন, শ্রমাই যীশুমাতা মেরী।

ইংরেজ মহিলাটির কাতরতা দেখে শ্রীমা সারদামণিও খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সহমর্মিতায় তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি ইংরেজ মহিলাটিকে সান্ত্বনা দিলেন, বললেন। 'তুমি চিন্তা করো না, তোমার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

মায়ের নির্দেশে গোলাপ-মা ঠাকুরের আশীর্বাদীয় একটি পদ্মফুল

নিয়ে এলেন। মা সেটি হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ জপ করলেন। তারপর সেই বিদেশিনীর হাতে তুলে দিলেন ফুলটি। ইংরেজ মহিলাটি মাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই চিঠি এল সেই ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে। মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এখন ওরা দেশের পথে পাড়ি দিচ্ছেন।

চিঠি পেয়ে মায়ের মন আনন্দে ভরে উঠল।

নিবেদিতার জন্য শ্রীমা তৈরি করলেন সামান্য একটা জিনিস—ছোট্ট একটা উলের পাখা। এই পাখা পেয়ে নিবেদিতার কি আনন্দ! পাখাটি একবার মাথায় ঠেকান, আরেকবার হাওয়া করেন। নিবেদিতা যাকে কাছে পান তাকেই দেখান পাখাটি।

নিবেদিতা দেশের মেয়েদের জন্য গড়ে তুললেন একটা শিক্ষায়তন। সেই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিবেদিতা নিয়ে গেলেন মাকে। তাঁর ধারণা, মায়ের আশীর্বাদ ভিন্ন কখনো আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে না।

একদিন নিবেদিতা তাঁর সহকর্মিনী ক্রিস্টিনকে নিয়ে এলেন শ্রীমায়ের কাছে। মাকে দেখিয়ে নিবেদিতা বললেন, 'উনি আমাদের মা—কালীমাতা!'

শ্রীমা পরিহাস ছলে বললেন, 'আর যা-ই বলনা কেন, আমি তোমাদের কালী হতে পারব না। অমন করে জিব বার করে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সবাই হাসতে হাসতে একেবারে লুটিয়ে পড়ার জোগাড় আর কি!

সেই নিবেদিতাও একদিন অকালে অমৃতলোকে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে শ্রীমা একেবারে ভেঙে পড়লেন।

একদিন দু'জন অল্পবয়েসী বিধবা মেয়ে এল শ্রীমায়ের সাক্ষাৎ-প্রার্থিনী হয়ে। সাদা পোশাকেই তাদের বৈধব্যের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল।

ওদের দেখেই শ্রীমা বললেন, 'তোমরা এই বয়সেই থান ধুতি পরেছ কেন? এতে তাড়াতাড়ি তোমাদের মনও বুড়ো হয়ে যাবে।' মা নিজের বাক্স খুলে দুজনকে দু'খানা শাড়ি বের করে দিলেন। কোনরূপ কুসংস্কার মায়ের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে নি।

শ্রীমা নিজেও বৈধব্যের পর পাড়ওয়ালা কাপড় পরেছেন। সেজন্য কামারপুকুরের লোকেরা মায়ের কত সমালোচনা করেছিল। কিন্তু মা সে সব কথায় কান দেন নি।

শ্রীমা একদিন বললেন, 'ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পর থেকে পৃথিবীতে সত্য যুগের সূচনা হল।'

ঠাকুর ছাঁচ করে গেছেন। সেই ছাঁচে ফেলে সবাইকে গড়ে তুলতে হবে। মনকে ঈশ্বর ভাবনার রসে ডুবিয়ে ঈশ্বরীয় ছাঁচে ফেলতে হবে। তবেই তো সাধনা সার্থক হয়ে উঠবে।

শ্রীমা সাধনা খুব সহজ করে দিলেন। যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী সাধন-ভজন। দীক্ষার পর একদিন একটি ছেলে এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মাগো, কবার জপ করব?'

শ্রীমা বললেন, 'তোমরা সংসারী মানুষ। একসাথে অনেকক্ষণ জপ করতে পারবে না। একশো আটবার জপ করলেই হবে।'

'মোট একশো আটবার'—ভক্তটি যেন অবাক হয়ে গেল। সে আরও অনেক বেশি আশা করেছিল।

অভয়দাত্রী মা বললেন, 'দেখ, এরচেয়ে বেশি পারবে না বলেই তো আমি একশো আটবার বলেছি। এখন রোজ একশো আটবার জপ করতে পারবে কি না তাই দেখ।'

আরেকটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'মা, আমি কতবার জপ করব?'

মা বললেন, 'তুমি দ্বাদশবার জপ করবে।'

আরেকজনের হাতে বাত, আঙুল নাড়াতে পারে না। মা তাকে

নির্দেশ দিলেন, 'তুমি পঁচিশটি রুদ্রাক্ষ দিয়ে একটা মালা গড়িয়ে নাও। সেই রুদ্রাক্ষের মালাটি স্পর্শ করে দিনে শুধু একবার জপ করবে—তা হলেই হবে।'

আরেকটি ছেলে বলল, 'আমি যে কিছুই করতে পারি না মা। আমার কি হবে?'

শ্রীমা বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার জন্য আমিই সব করব। আমি তোমাদের মা। এইটুকু নির্ভরতা থাকলেই তোমাদের সব হবে।'

একবার দুর্গাপূজার সময়ে মহাষ্টমীর দিন অনেক মহিলা এসেছেন। মায়ের পায়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করছেন আর নববস্ত্র নিয়ে মায়ের গায়ে পরিয়ে দিচ্ছেন। একটি মেয়ে এসেছে। সে কুণ্ঠিতা। অনেক চেষ্টা করে সে সামান্য একখানা কাপড় জোগাড় করতে পেরেছে। এই সামান্য কাপড়খানা যে কি করে মায়ের গায়ে তুলে দেয়—এই তার দ্বিধা।

শ্রীমা সারদামণির গায়ে কাপড়খানা তুলে দিয়েই দীনতার লজ্জায় মেয়েটির মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। অমনি শ্রীমা কাপড়খানা নেড়ে-চেড়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠলেন, 'সুন্দর পাড়টিতো। আজ মহাষ্টমীর দিনেই আমি কাপড়খানা পরব।'

এক কথায় মেয়েটির দারিদ্র্য লজ্জা হরণ করে দিলেন মা সারদামণি।

একদিন এক সন্ন্যাসী এসে হাজির মায়ের কাছে। ইনি একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী—হাতে রয়েছে তাঁর দণ্ড। মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন সন্ন্যাসী।

মা প্রথমে সংকুচিত হয়ে পাদু'খানি সরিয়ে নিতে চাইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর একান্ত আগ্রহ দেখে আর আপত্তি তুললেন না। সন্ন্যাসী সমস্ত গর্ব, পাণ্ডিত্য ত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নামিয়ে নিয়ে এলেন শ্রীমায়ের চরণতলে।

'সপ্তশতী' থেকে স্তোত্র পাঠ করে শোনালেন সন্ন্যাসী। তারপর মায়ের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন—শুধু ইহকালের জন্য নয়—পরকালের জন্যও।

মা সন্ন্যাসীকে ফল দিতে বললেন। একটি ভক্ত খুঁজে পেল তিনটি আম। মা এই তিনটি আম দিয়ে দিলেন সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী আমগুলি মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর ঝুলির মধ্যে পুরে চলে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ মায়ের কি খেয়াল হল। ভক্তটিকে ডেকে বললেন, 'দেখ, আরও আম আছে।' ভক্তটি খুঁজে খুঁজে আরও একটি আম বের করে নিয়ে এল।

শ্রীমা বললেন, 'যাও, দৌড়ে গিয়ে সন্ন্যাসীকে এই আমটিও দিয়ে এস।'

সন্ন্যাসী তখন অনেকটা দূরে চলে গেছেন। দৌড়ে গিয়ে ভক্তটি সন্ন্যাসীকে ধরল। বলল, 'মা আপনার জন্য আরও একটা আম পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

আমটা নিয়ে সন্ন্যাসী রাস্তায় দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিলেন। বলতে লাগলেন, 'আমার প্রতি মায়ের কি অসীম করুণা! তিনি প্রথমে আমাকে তিনটি ফল দিয়েছিলেন; সেগুলোর অর্থ হল—ধর্ম, অর্থ আর কাম। এখন চতুর্থ ফল মোক্ষও দিয়ে দিলেন।' সন্ন্যাসী অহংকার ত্যাগ করে দেবী নারায়ণীর পাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন বলেই তো মায়ের অসীম করুণা!

একদিন একটি মেয়ে প্রসাদ পাবার জন্য মায়ের কাছে ডান হাত বাড়াল। অমনি মা তাকে ধরলেন। বললেন, 'দুই হাত পেতে প্রসাদ নিতে হয়। প্রসাদে আর হরিতে কোন পার্থক্য নেই। তুমি হরিকে পেলে কি এক হাত দিয়ে ধরবে?'

অন্তরে দীনতা আনতে না পারলে হরিকে লাভ করা যায় না।

॥ একুশ ॥

১৯১৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। শ্রীমা জয়রামবাটিতে আছেন। ভক্তগণ সেদিন সেখানে মায়ের জন্মোৎসব পালন করবেন। অনেকে মায়ের জন্য নূতন কাপড় নিয়ে এসেছেন। শ্রীমা স্নান করে স্বামী সারদানন্দের দেওয়া কাপড়খানা পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করলেন। পূজা শেষে তিনি এসে একখানা তক্তপোষের উপর বসলেন। ভক্ত একটি মহিলা এসে মায়ের কপালে চন্দনের টিপ লাগিয়ে দিলেন এবং গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর ধীরে ধীরে ভক্ত সমাগম বাড়তে লাগল। ভক্তগণ এসে ফুল বেলপাতা দিয়ে মায়ের চরণবন্দনা করতে লাগল।

শ্রীমায়ের শরীর ভাল ছিল না প্রায়ই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হতেন। জন্মতিথিব দিন অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বিকালের দিকে আবার তাঁর জ্বর এল। কয়েকদিন ধরেই চলল চিকিৎসা। কিন্তু স্থানীয় চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া গেল না। ক্রমাগত জ্বরে ভুগে ভুগে মায়ের শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। এই অবস্থাতেও তিনি দীক্ষা-প্রার্থীদের বঞ্চিত করেন নি—দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

চিকিৎসার জন্য মাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মাকে কলকাতা নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থাই পাকা হল। শ্রীমা সারদামণি জননী জন্মভূমিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ধীর পায়ে পালকিতে আরোহণ করলেন। গ্রামবাসীরা পালকির সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। শ্রীমা কলকাতা এলে পর স্বামী সারদানন্দ মায়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন। একে একে

এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি সব রকম চিকিৎসারই বন্দোবস্ত করা হল। কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই রোগের উপশম হল না।

একদিন কলঘরে যাবেন মা। একটি ভক্ত মেয়ে হাত ধরে বিছানা থেকে তুলল। মায়ের শরীর খুবই দুর্বল। তবু একা একা চলেছেন কলঘরের দিকে—হঠাৎ মাথা ঘুরতে আরম্ভ হল। চেয়ে দেখলেন, দরজার পাশে রয়েছে একখানা লাঠি। লাঠিখানা দেখে শ্রীমা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মায়ের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ঠাকুরই যেন লাঠিখানার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেই লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি গেলেন স্নানের ঘরে।

অসুখের যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও, মায়ের মাতৃহৃদয় স্নেহে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। মায়ের সেবার জন্য অনেক ভক্তই উপস্থিত থাকত। মায়ের জন্য একটা কিছু করতে পারলে ওদের জীবন ধন্য হয়েছে বলে ওরা মনে করত। কিন্তু মা সহজে কারো সেবাগ্রহণে সম্মত হতেন না।

একদিন মা তক্তপোশে শুয়ে আছেন। ধারে কাছে একজন ভক্ত ছাড়া আর কেউ নেই। ভক্তটি ভাবল, এবার মাকে পাখা দিয়ে একটু হাওয়া করলে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। ভক্তটি মায়ের শিয়রের কাছে গিয়ে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল। মিনিট দু-তিনেক হাওয়া করার পরই মা বললেন, 'নিশ্চয় তোমার হাত ব্যথা করছে—আর হাওয়া করো না।' ছেলেটি জানাল যে, এত সহজে তার হাতে ব্যথা হবে না! হাত ব্যথা হলে সে হাওয়া করা বন্ধ করে দেবে। মা বললেন, 'তোমার হাত ব্যথা হবে ভেবে ভেবে আমার কিন্তু ঘুম আসবে না। বরং তুমি পাখাকরা বন্ধ করে দাও, তাহলেই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি।' ছেলেটি আর কি করে! পাখা করা বন্ধ করে দিল।

প্রাণবন্ধুবাবু মায়ের চিকিৎসক—ষোল টাকা তাঁর ভিজিট—সাথে পাঁচ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া। একদিন শ্রীমায়ের নির্দেশে ডাক্তারের

গাড়িতে প্রচুর ফুল-ফল-মিষ্টি তুলে দেওয়া হল। ডাক্তারবাবু খ্রীস্টান। তবুও মায়ের দেওয়া আশীর্বাদীয় ফুল-ফল পেয়ে খানিকটা অভিভূত হলেন। পরের দিন আবার তিনি মাকে দেখতে এলেন। মায়ের ঘরে রাখা সুসজ্জিত ঠাকুরের ছবিখানি দেখে তিনি একেবারে থমকে দাঁড়ালেন। নীচে নেমে সারদানন্দকে বললেন, 'মশাই, আমি এতদিন ধরে কার চিকিৎসা করছি? এঁযে সাক্ষাৎ ভগবতী! অবোধ আমি। এতদিন কিছুই বুঝতে পারিনি।'

স্বামী সারদানন্দ ভিজিটের টাকা দিলে তিনি কেঁদে ফেললেন। ফিরিয়ে দিলেন সে টাকা।

শ্রীমা বুঝতে পারলেন তাঁর দেহরক্ষার আর বেশিদিন বাকী নেই। ধীরে ধীরে তিনি সমস্তরকম বন্ধন ছিন্ন করে দিতে লাগলেন। একদিন একজনকে ডেকে বললেন, 'ঠাকুরের ছবি আমার ঘর থেকে পাশের ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাও। আর আমার বিছানা খাট থেকে নামিয়ে মেঝের উপর করে দাও।'

কিছুদিন ধরে রাধুরও খোঁজ নিচ্ছেন না মা। এমনকি রাধুর ছেলেরও নয়। যারা এতকাল ছিল মায়ের নয়নের মণি, এখন মায়ের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই তাদের প্রতি।

একদিন মা রাধুকে ডেকে আনলেন পাশটিতে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তোরা জয়রামবাটি চলে যা।'

রাধু কেঁদে কেঁদে আপত্তি করল। মা রুগ্ন অথচ জোরালো কণ্ঠে বললেন, 'আমি বলছি তোরা চলে যা। আর এখানে থাকবিনে।'

রাধু হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। অসহায় রাধুর প্রতি মা এখন সম্পূর্ণ উদাসীন। কঠোর কণ্ঠে শরৎ মহারাজকে নির্দেশ দিলেন ওদের জয়রামবাটি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে। বললেন মা, 'আমি মন তুলে নিয়েছি। ওদের মায়াও কাটিয়ে ফেলেছি। ভেঙে দিয়েছি আমার খেলাঘর।'

যোগীন-মা কাঁদতে লাগলেন। মায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'তুমি মন তুলে নিলে আমরা বাঁচব কি করে? রাধু আর ওর ছেলেটা বাঁচবে কি করে?'

মা যেন আরও নিষ্ঠুরের মত বললেন, 'মায়া কাটিয়ে ফেলেছি সমূলে রাধু আমার কেউ নয়—ওর ছেলেও আমার কেউ নয়।'

শরৎ মহারাজ বুঝতে পারলেন আর মাকে এই ধরাধামে ধরে রাখা যাবে না। রাধুর উপর থেকে মন যখন তুলে নিয়েছেন, তখন আর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার কোন আশা নেই।

তবুও শরৎ মহারাজের শেষ চেষ্টা। সরলাকে ডেকে নিলেন নিভৃতে। বললেন, 'তোমরা মায়ের কাছাকাছি থেকে রাধুর উপর মায়ের মন ফেরাও—এ-ই মায়ের শেষ চিকিৎসা।'

সরলা কাছে যেতেই মা দীপ্ত কণ্ঠে বলে দিলেন, 'পারবে না সরলা যে মন একবার তুলে নিয়েছি, চেষ্টা করেও তা নামাতে পারবে না।'

রাধু একদিন পাঠিয়ে দিল ছেলেকে মায়ের কাছে। হামাগুড়ি দিতে দিতে ছেলেটি প্রায় মায়ের শয্যার কাছে চলে এল। রাধু আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগল। মা হঠাৎ চোখ মেলে চাইলেন—দেখলেন রাধুর ছেলেকে। বললেন, 'আর এগিয়ে আসিসনে। আমি তোর মায়াক াটিয়ে ফেলেছি।'

শিশুটি চুপ করে বসে রইল। একটি ভক্ত মেয়ে ঘরে ছিল। মা ওকে বললেন, 'আমি আর এখন ওকে চাই না। ওকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নে।'

কাঁদতে লাগল রাধু। কাঁদতে লাগল রাধুর ছেলে। কাঁদতে লাগল সবাই।

দেখতে দেখতে মহাকালের আহ্বান এসে পড়ল। মৃত্যুর পূর্বে শরৎ মহারাজকে বলে গেলেন শ্রীমা, 'শরৎ এরা সব রইল।'

১৩২৭ বাংলার ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত দেড়টায় শ্রীমা সারদামণি

দেহরক্ষা করলেন।

পরদিন ভোর হতে না হতেই মায়ের মুখমণ্ডলে দেখা গেল অপূর্ব জ্যোতি—যেন আ.ঝন মাসের দুর্গার মূর্তি। যাঁরা মায়ের কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা সেই অপূর্ব দিব্য জ্যোতি দর্শন করে মুগ্ধ হলেন।

সকালবেলা শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীমায়ের মরদেহ নিয়ে যাওয়. হল বেলুড় মঠে। গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হল। বেলুড় মঠের কাছে চিতা রচনা করা হল। দুটো নাগাদ প্রজ্জ্বলিত হল চিতার অগ্নি। চিতার অগ্নি নির্বাপিত হবার পূর্বেই গঙ্গার অপর পারে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হতে লাগল। শঙ্কিত হয়ে পড়লেন সবাই। কিন্তু না, বৃষ্টি এপারে হল না। সন্ধ্যা পূর্বে চিতার অগ্নি নির্বাপনের জন্য যেই স্বামী সারদানন্দ কলসী দিয়ে প্রথম জল ঢাললেন, অমনি শুরু হল বর্ষণ। গভীর বেদনা নিয়ে সবাই নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। মাতৃহারা আকাশ বুঝি সবার অন্তরের বেদনা নিয়ে ঝরে পড়তে লাগল।